অনুসরণ

(প্রথম পর্ব)

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট
১২/১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (বিতল)
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ২৭শে এপ্রিল ১৯৬০

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ঃ বিশ্বপতি মাইতি

'একাল সেকাল প্রকাশনী' প্রকাশক শ্রীপবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় ১।১এ পদ্মপুকুর স্কোয়ার কলিকাতা-৭০০০২৩ এবং শ্রীহিমাদ্রী রায়, রামকৃষ্ণ প্রেস, ৯এ রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা-৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত।

স্নেহের
দুর্গামাকে
আদ্যাপীঠ

একটু আগে পড়ার টেবিল ছেড়ে বাবা রাগ করে উঠে গেছেন। সোনালি ফ্রেমের চশমাটা পড়ে আছে একপাশে। সাতটা অঙ্ক দিয়েছিলেন। একটাও আমি পারিনি। বারবার বুঝিয়ে দেবার পরও না। আমার মাথায় যে গোবর ভরা আছে তা আমি জানি। অফিস থেকে এসে এক কাপ চা খেয়েই পড়াতে বসেছিলেন। না পারলে বাবা আমাকে মারেন না। তিনবার চারবার পাঁচবার বুঝিয়ে দেন। জিজ্ঞেস করেন 'বুঝেছো? বুঝেছো? বুঝেছো?' যদি বলি 'হ্যাঁ' বলেও যদি না পারি তাহালেই মুখটা থমথমে মতো হয়ে যায়। ক্রমশ লাল হতে থাকে। একসময় বলেন, 'না ব্যর্থ চেষ্টা। যা হবার নয়, তা হবার নয়। সকলের সব কিছু হয় না, পড়াশোনা তোমার লাইন নয়। অকারণ সময় নষ্ট না করে, অন্য কিছু চেষ্টা করো।'

আমার সামনে খাতা খোলা। পেনসিল গড়াগড়ি। রাতের মৃদু বাতাসে বইয়ের পাতা ফিরফির করছে। বাইরের আকাশে বিশাল এক চাঁদ। চারপাশ যেন খলখল করে হাসছে। আর আমার চোখে জল। কেন আমার মাথায় কিছু ঢোকে না ভগবান। আমার বন্ধু বিশু প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। সাংঘাতিক ভালো ফুটবল খেলে। সুন্দর আবৃত্তি করে। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের দিন স্কুলের নাটকে অভিনয় করে। ফটাফট হাততালি পায়। পদকের পর পদক। সুন্দর স্বাস্থ্য। সবসময় হাসছে। যখন হাঁটে মনে হয় সিনেমার হিরো হাঁটছে।

আমার এখন বিশুর কথা মনে পড়ছে। এই অঙ্ক সাতটা কষতে তার বড় জোর পনের মিনিট সময় লাগত্‌। মুক্তোর মতো হাতের লেখা। তেমনি তার জেনারেল নলেজ। ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠে। বিশু যখন ছোট ছিল তখনই তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। এখানে মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। মামারা ভীষণ ভালো। চারটের

উঠে বিশু তার বড় মামার সঙ্গে ব্যায়াম করতে যায়। ফিরে এসে স্নান করে আদা-ছোলা খেয়ে পড়তে বসে। বিশু আমার খুব বন্ধু। ফার্স্ট হয় বলে এতটুকু অহঙ্কার নেই। বরং সেকেণ্ড বয় পার্থর সাংঘাতিক ডাঁট। কারোর সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। এই বয়সেই চোখে চশমা। কথা যা বলে তাও ইংরিজিতে। একটা ইংরিজি প্রায়ই বলে, 'প্রব্যাবলি'। সবেতেই 'প্রব্যাবলি'। আমরা তাকে প্রব্যাবলি বলে ডাকি। আরও রেগে যায়। বলে, 'আনকালচারড'। বিশুকে ধরার চেষ্টা করে। শুনেছি দিনে-রাতে বারো ঘণ্টা পড়ে। যতই চেষ্টা করুক বিশুকে মারতে পারে না। পার্থর বাবা বিলেতে থাকেন্।

বিশু আমাকে বলে, 'কি নিয়ে ডাঁট দেখাবো বল? আমার কে আছে? কি আছে? মা প্রায় অন্ধ। মামার বাড়িতে পড়ে আছি। যে ভাবেই হোক আমাকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে। কোনও রকমে পড়া শেষ করে একটা চাকরি জোগাড় করতে না পারলে আমার চলবে না। আমার মাকে আমি যতদিন না সোনার সিংহাসনে বসাতে পারছি ততদিন আমার শান্তি নেই। মামার বাড়িতে মা যেন এক রাঁধুনী। আমার মায়ের যা কষ্ট। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই বিশু কি না করতে পারে তার মায়ের জন্যে।'

মায়ের কথা বলতে বলতে বিশু যেন কি রকম হয়ে যেত। তাকে আরও বড় দেখাত। আরও যেন শক্তিমান। যেন একটা লোহার মূর্তি। দু'হাতে জাপটে ধরে পৃথিবীটাকে চুরমার করে দেবে। মাথাটা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। বিশু তো অনেক কিছু পড়ে। আমাকে একটা গল্প বলেছিল। শঙ্করাচার্য কি করেছিলেন মায়ের জন্যে। শঙ্কর তো কেরলের কালাডিতে জন্মেছিলেন শিবঠাকুরের দয়ায়। আর যখন মাত্র তিন বছর বয়েস তখন মারা গেলেন তাঁর বাবা। কে আর রইল সংসারে! মা ছাড়া কেউ নেই। বাড়ি থেকে অনেক দূরে আলোয়াই নদী। সেই নদীতে রোজ তার মা

স্নান করতে যেতেন। হেঁটে হেঁটে। সে কি কম দূর। স্নান করে রোজ ফিরে আসতেন বারোটা একটার মধ্যেই। একদিন হল কি, অনেক বেলা হয়ে গেল, তবু মা ফিরছেন না। মহা ভাবনা হল শঙ্করের। মায়ের খোঁজে চললেন নদীর দিকে। প্রচণ্ড রোদ। চারপাশে যেন আগুন লেগে গেছে। কিছুটা দূর যাবার পর শঙ্কর দেখেন কি, রাস্তার একপাশে তাঁর মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মায়ের অবস্থা দেখে শঙ্কর কেঁদে ফেললেন। ভগবানকে বললেন, ঈশ্বর আপনি আমার মায়ের, আমার এই দুঃখিনী মায়ের কষ্ট দেখতে পান না! আপনার তো অসীম ক্ষমতা, দিন না মায়ের প্রিয় ওই আলোয়াই নদীকে আমাদের বাড়িব কাছাকাছি এনে। তাহলে আর আমার মায়ের এত কষ্ট হয় না। ও মা! ঈশ্বরের কি অসীম করুণা! কয়েক দিনের মধ্যেই পাল্টে গেল নদীর গতিপথ। আলোয়াই নদী চলে এল শঙ্করের বাড়ির দোর গোড়ায়।

একটু আগে আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল। মাথাটা ঢুলেঢুলে সামনে পড়ে যাচ্ছিল। বাবা রাগ করে উঠে যাবার পর আমার চোখ বড বড় হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে আমি আব এ বাড়িব কেউ নয়। আমার বাবা, আমার জ্যাঠামশাই, আমাদের বংশের সবাই ভীষণ শিক্ষিত। আমার বাবা তো সব পরীক্ষায় প্রথম হতে হতে স্কলারশিপ পেতে পেতে আজ এক মস্ত মানুষ। বিরাট চাকরি করেন। কত বড একটা লাইব্রেরি করেছেন। সব সময় বই পড়েন। আবার খুব সুন্দর বেহালা বাজান। খাতা পেনসিল ছাড়াই অঙ্ক কষেন মুখে মুখে। লোকে কি বলবে, আমি তো নিজেই বুঝতে পারি, অমন বাবার এমন ছেলে হতেই পারে না। আমার মার খাওয়াই উচিত। বাবার সঙ্গে যখন বেডাতে বেরোই তখন আমি একটু দূরে দূরে হাঁটি। আমার মনে হয়, পাশে পাশে হাঁটলে বাবার লজ্জা করবে। বাবার পাশে বিশুকেই মানায়।

আজ আমাদের বাড়িতে খুব ভালমন্দ রান্না হয়েছে। এখনও হচ্ছে। ভারি সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে। অন্যদিন হলে রান্নাঘরে

গিয়ে একটু চেখে আসতুম। আজ আমার রাতের খাবার খেতেও লজ্জা করবে। অপদার্থ আমি। কেউ না বললেও আমি শুনতে পাই, সবাই যেন মনে মনে বলছে, লেখাপড়ায় খাজা আবার গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছে। খেলা ছাড়া আর কি জানে! যেদিন আমার জন্যে বাবা খুব কষ্ট পান, সেদিন আব তিনি কিছুই খান না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে নিজের লেখাপড়া শুরু করে দেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'কেউ তো কিছু করলে না, নিজেই করে যাই। কত কি পড়ার আছে, কত কি জানার আছে।' টেবিল আলোর সামনে খোলা বই, দুপাশে বইয়ের পাহাড় ক্রমশই তিনি তলিয়ে যেতে লাগলেন অন্য জগতে। অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা, ইংরিজি সাহিত্য। রাত চলেছে। পড়া চলেছে। ওদিকে খাবার ঘরে সবাই বসে থেকে থেকে, এক সময় সব চাপাচুপি দিয়ে চলে আসে। রান্না হল, খাওয়া হল না। আমার জন্যে সকলের উপোস।

মাথা নিচু করে খাতায় আঁকিবুকি কাটছি আর ভাবছি। সামনে তিন সার অঙ্ক। বাবার অনেক চেষ্টা আমাকে বোঝাবার। মাথার পেছনে একটা হাত এসে পড়ল। আলতো একটা হাত। মুখ তুলে তাকালুম। আমার জ্যাঠামশাই ভীষণ ভালবাসেন আমাকে। আমার দুঃখ হলে তাঁরও দুঃখ হয়। আমার আনন্দে তাঁর আনন্দ। জ্যাঠামশাইয়ের দু' চোখে জল। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'একটু মন দিয়ে পড়ো না বাপি। কেন পারবে না। নিশ্চয় পারবে। একটা রোক করো।'

আমার চোখেও জল এসে গেল। পটপট করে চার পাঁচ ফোঁটা জল পড়ল খাতার পাতায়। কোঁচার খোঁট দিয়ে চোখের জল মোছাতে মোছাতে জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমাদের বংশ হল লেখাপড়ার বংশ। সেই বংশের ছেলে তুমি। কেন তোমার হবে না! তোমার মনে হবে না-টা ঢুকে গেছে। তাড়াও ওটাকে। ভয় তাড়াও।'

যা ভেবেছিলুম তাই। রাতে কারোর খাওয়া হল না। বাবা কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। দেখি মা-ও কথা বলছে না। বাবা কেবল

বলেন, 'তোমার ছেলে। তোমার ছেলে।' বিশুর সঙ্গে তুলনা করেন। মায়েব তো অপমান হয়। আমার জন্যেই হয়। শুয়ে আছি, ঘুম আর আসেই না। চিন্তায়, চিন্তায় মাথার ভেতরটা জবরজং হয়ে আছে। কারোকে কিছু না বলে আমি নিরুদ্দেশে চলে যাবো। কত ছেলেই তো যায়! আমি বোকা হতে পারি; কিন্তু বদমাইশ তো নই। আমার কাছে কিছু জমানো টাকা আছে। সেই টাকায় এমন একটা জায়গায় চলে যাবো, যেখানে নদী আছে, আশ্রম আছে। সেই আশ্রমে বড একজন সাধু থাকবেন। মুখে মিষ্টি হাসি। চোখে জ্যোতি। আমি বলবো, 'সাধুজী আমার কেউ নেই।' না মিথ্যে কথা বলবো না। সব সত্যি কথা বলবো। বলবো, 'আমি সন্ন্যাসী হব। আমার ঠাকুর্দা সন্ন্যাসী ছিলেন, আমিও সন্ন্যাসী হব।' খুব করে ধরলে আমাকে আর 'না' বলে তাড়াতে পারবেন না। কানে ভেসে এল বেহালার সুর। বাবা জেগে আছেন। বেহালার করুণ সুর শুনে বুঝতে পারছি বাবা কাঁদছেন। বেহালা দিয়েই বাবা তাঁর মনের অবস্থা সকলকে বুঝিয়ে দেন। নিশ্চয় আমার মা-ও এখনও জেগে আছেন। এখন দরজা খুলে বেরনো যাবে না। বেহালা ভীষণ কাঁদছে।

সকাল হয়ে গেল। মশারির বাইরে এসে দাঁড়ালেন জ্যাঠামশাই। কত মিষ্টি গলা তাঁর! 'পিন্টু, ওঠো। ভোর হল। কাল সারারাত কিছু খাওনি তুমি। মুখ ধোও। আমি গরম জিলিপি আর কচুরি কিনে আনি।'

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলুম। আজ তো আমার চিরকালের মতো চলে যাবার দিন। আমার আর কোনও কষ্ট নেই, একটাই কষ্ট, এমন সুন্দর জ্যাঠামশায়কে আর কোনও দিন দেখতে পাবো না। সেই কবে আমি যখন খুব ছোট, একদিন খবর এলো জ্যাঠাইমা মারা গেছেন। জ্যাঠাইমার বাপের বাড়িতেই ঘটনাটা ঘটে গেছে হঠাৎ সেই থেকে আমার জ্যাঠামশাই একা। ভীষণ একা। আমি মনে মনে ভাবতুম, বড় হই, তারপর আমি জ্যাঠামশাইয়ের সমস্ত

দুঃখ দূর করে দোব। জ্যাঠামশাইয়ের কেউ যখন নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, আমি তখন আছি। জ্যাঠামশাই সকলকে এখনও বলেন, দেখবে তোমরা, 'পিন্টু কত বড় হবে! বিজ্ঞানী হবে। কত সম্মান পাবে দেশে বিদেশে। পিন্টুর গাড়ি এসে দাঁড়াবে বাড়ির সামনে। ও অমনি হুস করে চলে যাবে আমাদের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে। অফিসের গাড়ি নয়, নিজের গাড়ি। আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সময়ও তখন ওর থাকবে না। কাজ আর কাজ। মিটিং। আজ আমেরিকায় তো কাল লণ্ডনে। আজ ভিয়েনায় তো কাল জার্মানিতে।' জ্যাঠামশাই যখন বলতেন, তখন একপাশে দাঁড়িয়ে আমি মিটিমিটি হাসতুম। শুনতে আমার ভীষণ ভাল লাগত। মনে হত, না হয়েই আমি হয়ে গেছি। আমার ফ্রেঞ্চ-কাট একটা দাড়ি হয়েছে। চোখে গোল মতো সোনার ফ্রেমের জ্ঞানী চশমা। মুখটা গম্ভীর আর ভাবি। প্রফেসার পিন্টু। অনেকে আবার জ্যাঠামশাইয়ের সমালোচনা করতেন। বটঠাকুর বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। বেশি আদরে ছেলেরা বাঁদর হয়ে যায়। জ্যাঠামশাই মাটির মানুষ। তিনি হাসতে হাসতে বলতেন, ছেলেদের মধ্যে এমনি করেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাতে হয়।

জ্যাঠামশাই মশারি তুলে ধরলেন। আমি নেমে পড়লুম ফাঁক দিয়ে। জ্যাঠামশাই আমার চুল ঘেঁটে দিয়ে বললেন, 'চিয়ার-আপ'। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম তাঁর দিকে। রোজ যে-সকাল হয় সেই সকাল। আকাশ ভাঙা আলো। অজস্র পাখির প্রার্থনা; কিন্তু আমার কাছে একেবারে অন্যরকম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কাল রাতে আমার ভীষণ জ্বর হয়েছিল। মনে হচ্ছে, কাল রাতে আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছিল। সব পুড়েঝুরে গেছে। আমি সেই ছাইয়ের ওপর জেগে উঠেছি। জ্যাঠামশাই আমার পিঠে দু'বার চাপড় মেরে বললেন, 'হতাশ হবার কি আছে! মনটাকে শক্ত করে লেগে পড়ো, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

ঘরের বাইরে এসেই বাবার মুখোমুখি। তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে

গেলেন। আমি জানি ঘেন্নায় বাবা আমার মুখের দিকে তাকালেন না। আমি কোনও অন্যায় করলে, কেউ কোনও অন্যায় করলে, বাবা একেবারে অন্যরকম হয়ে যান। তিন দিন, চারদিন একেবারে না খেয়ে থাকেন। যার জন্য তিনি এইরকম করেন, তাকে অন্য সকলে যা-তা বলতে থাকে। যেমন একটু পরেই মা আমাকে বলবেন, 'একটু বুদ্ধি খাটিয়ে পড়লেই তো হয়। লেখাপড়া না করলে বড় হয়ে তো ভিক্ষে করতে হবে।' আমার পিসিমা নাকের ডগায় চশমা নামিয়ে বলবেন; 'তোর *জন্য* এইবার মানুষটা না খেয়ে মরবে।' এমন কি আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে, সেই মহিলাও বলবে, 'রোজ রোজ পড়া নিয়ে তোমার এই খ্যাচাখেচি ভালও লাগে বাপু! পড়বে তো পড়ো, না পড়বে তো ছেড়ে দিয়ে কলকারখানায় কাজ শেখো না! বাড়িতে একটু শান্তি আসুক।' যাঁরা বেড়াতে আসবেন তাঁরাও বলবেন, 'পড়াশোনা কি সকলের হয়! বাপ শিক্ষিত হলেই কি আর ছেলে শিক্ষিত হয়।' চিমটি কাটা কাটা কথা। কথার লঙ্কাবাটা। সব আমাকে সহ্য করতে হবে মুখ বুজে। কেউ আবার বলবেন, 'এই বয়েসটা তো আবার ভাল নয়। গেঁজে যাবার বয়েস।'

বাথরুমের কল দিয়ে জল পড়ছে বালতিতে, আর আমি শুনছি ঝরনার শব্দ। পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। অনেকটা উঁচুতে সাদা একটা মন্দির। আশ্রম। গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী। তিনি যেন আমাকে ডাকছেন, আয়, আয় চলে আয়। এখানে কত শান্তি। অঙ্ক নেই, ভূগোল নেই, ইতিহাস নেই, সমাজবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান নেই। পরীক্ষা নেই। পাশ-ফেল নেই। কারোর সঙ্গে কারোর তুলনা নেই। এখানে পাহাড়ের মাথায় সাদা সাদা বরফ জমে। সেই বরফ গলে ঝরনা হয়। ঝরনা থেকে নদী। বসন্তে চারপাশ ফুলেফুলে ভরে যায়। তুই চলে আয়।

দৃশ্যটা এত স্পষ্ট হল, যে আমার মনে হচ্ছে সত্যিই আমি চলে গেছি সেখানে। না, আমি যাবো। আমি যাবোই। আমাকে জ্যাঠামশাই ছাড়া কেউ ভালবাসেন না। সবাই ঘেন্না করেন। এ-বাড়িতে

আর সকলের ভালবাসা পেতে হলে পরীক্ষায় ফার্স্ট, সেকেণ্ড হতে হবে। একশোর মধ্যে একশো পেলেই ভাল হয়। বড় জোর নিরানব্বই! আমি পারবো না। আমার মাথা ভাল নয়। কোথা দিয়ে কি হয় আমি বুঝতে পারি না। অঙ্ক ভীষণ প্যাঁচোয়া। আমার কিছুই তেমন মনে থাকে না। কে কবে রাজা হল, কোন দেশ কবে স্বাধীন হল, আমার জানার কোনও দরকার নেই। আমি জানি, আমাদের এই জায়গাটার নাম ষষ্ঠীতলা। পশ্চিমদিকে দু'মিনিট হাঁটলেই গঙ্গা। গঙ্গা আসছে সেই কোন দূর গোমুখ থেকে। সেখানে পাহাড়ে আকাশে কোলাকুলি। ঋষির আশ্রম। নদীর শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। আমাদের গঙ্গা সেই পাহাড়ের খবর নিয়েই বহে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কত তীর্থের ফুল ভেসে আসতে চায়। কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার। গঙ্গার ধারে ধারে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই আমাদের মহাশ্মশান। যেখানে আমি মাঝে মাঝে যাই মানুষের চলে যাওয়া দেখতে। ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ, কে যে কখন যাবে। কোনই ঠিক নেই। বলে, 'ডাক এসেছে আমার সে-দেশ থেকে।' সেই দেশের কথা আমার কোনও বইয়ে লেখা নেই। কিন্তু ডাক আসে। যে যায় তার জন্যে সবাই কাঁদে, কারণ এই যাওয়া একেবারেই যাওয়া; সে আর কোনও দিন ফিরে আসবে না। যতো, যতোই কাঁদ, সে আর আসবে না। এই যে আমার বন্ধু সত্য চলে গেছে, এক বছর, দু বছর, তিন বছর, আজ চার বছর হল। সত্য জন্মদিনে একটা বই আর একটা কলম দিয়েছিল আমাকে। আমি দেখি আর ভাবি, কোথায় সত্য আর কোথায় আমি! কিলো-মিটারে এ দূরত্ব মাপা যাবে না।

আমার এই জায়গাটাই আমার স্বর্গ। পুরনো কালীবাড়িতে সন্ধেবেলা আরতি হয়। কোথা থেকে ছুটে আসে কুচকুচে কালো রঙের দুটো কুকুর। কুকুর দুটো সমানে শাঁখের সুরে ডাকতে থাকে। পাগলা ভোলা ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘড়ি বাজায়। বৃদ্ধ শ্যামবাবু নেচে নেচে ঘণ্টার দড়ি ধরে টানতে থাকেন। শিববাবু টকটকে লাল

কাপড় পরে মায়ের সামনে থেবড়ে বসে উদাত্ত চিৎকার তোলেন, মা, মা, জগদম্বা। জগদম্বা বলার সঙ্গে সঙ্গে থামের খাঁজে খাঁজে ঘুমিয়ে থাকা পায়রারা চমকে উঠে ডানা ঝাপটাতে থাকে। দুঃখী, দুঃখী চেহারার সন্ধ্যার মা একপাশে বসে থাকেন মায়ের দিকে তাকিয়ে। দু' চোখে জলের ধারা। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে এইসব দেখি। পাথরের দালান। প্রাচীন ঝাড়বাতি। শিবের ঘর। সামনের মাঠে হাঁড়িকাঠ। রাতের অন্ধকারে হাঁড়িকাঠটাকে দেখলে ভয় করে। লোটা লোটা কান কত কচি ছাগলের জীবন নিয়েছে এই কাঠ। পঞ্চপ্রদীপের শিখা মায়ের কালো বুকের সামনে নেচে ওঠে। আরতি শেষ হবার পর যখন নিস্তব্ধতা নেমে আসে, ঠ্যাং করে ঘণ্টা বাজিয়ে শেষ ভক্তটি উঠে চলে যান, তখন আমার যেন আরও ভাল লাগে। ফুল, বেলপাতা, ধূপের গন্ধ। আতর মেশানো চরণামৃত। মায়ের কালো মুখ। লাল লকলকে জিভ। হাসি হাসি চোখ। কেউ নেই। আমি আর মা। ধপধপে, মোটাসোটা চেহারার পূজারী একপাশে বসে সব গোছগাছ করছেন। এ মা কোনও দিনও বলবেন না, 'পিণ্টু, তুই একটা কুলাঙ্গার। বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছিস।' কতদিন মনে হয়েছে, আমি যদি ওই পূজারী হতে পারতুম। ভারি গম্ভীর গলা। সংস্কৃতে যখন মন্ত্র বলেন তখন মনে হয় পাথরে পাথরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মন্দিরের লাগোয়া ছোট্ট একটা ঘরে থাকেন। নিজে রেঁধে খান। কারোর সঙ্গে বেশি কথা বলেন না। নকশাল আমলে ছেলেরা মন্দির ভাঙতে এসেছিল। মায়ের হাতের খাঁড়াটা নিজের হাতে নিয়ে মন্দিরের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'ক্ষমতা থাকে আগে আমাকে মারো, তারপর মায়ের গায়ে হাত।' খাঁড়া হাতে শুরু করলেন চণ্ডীপাঠ। সবাই মাথা নিচু করে ফিরে গেল। অবিশ্বাসীরা বললেন, 'আহা! এতে আর মায়ের মাহাত্ম্য কি হল! ছেলেরা দয়া করে ছেড়ে দিলে।'

ছোট্ট একটা তেলেভাজার দোকান আছে আমাদের পাড়ায়। ভাই বোনে দোকান চালায়। আমার মনে হয় ঈশ্বর যদি আমার

সব কেড়ে নেন নিন, আমাকে ওইরকম একটা বোন দিন। আমিও একটা তেলেভাজার দোকান দোবো। বিরাট কড়ায় ফুটন্ত তেলে হাবুডুবু খাবে গোল গোল ফুলুরি। আমার বোন গামলায় বেসন ফেটাবে। চুড়ির আওয়াজ উঠবে রিমৃঠিন্। দোকানের সামনে লাইন পড়ে যাবে। আমি মাঝে মাঝে দোকানটায় যাই। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকি একপাশে। মনে হয় যন্ত্রসংগীত হচ্ছে। সেতার আর তবলা! কি সুন্দর বোঝাপড়া দু'জনে। এখানে অঙ্ক যা আছে খুবই সহজ। লেখা-পড়া নেই আছে বোঝাপড়া।

গঙ্গার ধারে সার সার বাগান বাড়ি। বিশাল বিশাল গেট তালা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। লম্বা লম্বা দেবদারু গাছ। বাতাসের দীর্ঘশ্বাস পাতায় পাতায়। ওই বাড়িগুলো আমার ভীষণ প্রিয়। একা একা ঘুরে বেড়াই। হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ভাবি, কত কি হত এখানে! কত লোক, কত আলো, কত গান, কত কথা, কত খাওয়া। সব কোথায় গেল!

আমার এই সুন্দর জগৎ ছেড়ে আমি কোথায় যাবো! তবু আমাকে যেতেই হবে। আর না! এদের আমি কেউ নই। আমি আই. এ. এস হতে পারব না; কারণ আমার অঙ্কে মাথা নেই। আমি একটা গবেট। বাংলাটা মোটামুটি ভালই লিখতে পারি। স্কুলে আমার বাংলার মাস্টারমশাইয়ের অন্তত সেই রকমই ধারণা। তা বাংলায় ভাল হয়ে আমার হবেটা কি? বাংলার অধ্যাপক হব কোনও কলেজে! অত সোজা নয়। আমার বলতে গেলে কোনও ভবিষ্যতই নেই। বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকা ছাড়া। ধুৎ, আমি চলেই যাই। কত ছেলেই তো হারিয়ে যায়!

জ্যাঠামশাই ছাদে ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে ইশারায় ডাকলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'পিণ্টু সোজা ছাতে চলে যাও। ছাতের ঘরে তোমার জন্যে খাবার চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। চট্ করে খেয়ে নেমে এস। আজ আমি তোমাকে পড়াবো।'

'ছাতে গিয়ে খাবো কেন জ্যাঠামশাই?'

'আমরা তো কেউ খাচ্ছি না। তোমাকে খেতে দেখলে কেউ আবার যদি কিছু বলে বসে! বলা তো যায় না।' আর ঠিক সেই সময় ও-পাশের ঘরে বাবা, মাকে বেশ জোরে জোরেই বলছেন 'পণ্ডশ্রম করে লাভ নেই। ওকে দিয়ে যতটা পারো বাড়ির কাজ কর্মই করাও। দোকান-বাজার, ঘর ঝাঁট, গম ভাঙানো, রেশান আনা, ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া।'

মা বলছেন, 'কি বলছ তুমি? রেগে গেলে তোমার যা মুখে আসে তাই বলো! আমাদের ওই একটি মাত্র ছেলে মানুষ হবে না?'

'অনেক, অনেক চেষ্টা হয়েছে। যা হবার নয়, তা হবার নয়। যতদিন না কোনও কলে-কারখানায় ঢোকাতে পারছি, ততদিন ওকে সংসারের কাজে লাগাও। 'গবেট, ডান্‌স। গোঁফ দেখে যেমন শিকারী বেড়াল চেনা যায়, মুখ দেখে তেমনি ছেলে চেনা যায়। ওর মুখটা দেখেছ, যেন হাবলা-গোবলা একটা শিশু। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। গাছের পাতা দেখছে, কাক দেখছে। আকাশের মেঘ দেখছে। চোখ দেখলেই বোঝা যায় ভেতবে কিছু নেই। হস্তী মূর্খ।'

'কি বলছ তুমি? ও এখনও শিশুর মতো সরল। ওর ভেতরে একটা কবি আছে।'

'তাহলে সারা জীবন তোমার আঁচলের তলায় রেখে দাও। বড়দার কোনও ছেলে-মেয়ে নেই। বংশে ওই একটি মাত্র ছেলে। সে কি করবে? না কবিতা লিখবে! আহা! কী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!'

জ্যাঠামশাই আমাকে ঠেলে ছাতে পাঠিয়ে দিলেন। খোলা ছাতে এসে মনে হল, মানুষের পৃথিবীতে কেবল স্বার্থ! কিছু একটা কেউকেটা হতে পারলেই খাতির। হয় বিদ্যা, না হয় অর্থ! আমাদের পাড়ার মিষ্টির দোকানের মালিকের কি খাতির! কারণ তাঁর সাতটা দোকান, দুটো বিশাল বাড়ি, তিনটে গাড়ি। তিনি তো কারোর সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে চান না। আমার বাবার মতো পণ্ডিত মানুষকেও নাম ধরে ডাকেন। তাঁর প্রাণের বন্ধু হলেন কণ্ট্রাকটার যদু মল্লিক। তাঁরও সমান সমান পয়সা। তা এ-বাড়িও তো স্বার্থপরই। অহঙ্কারী।

অঙ্কে একশো পেলে খুব খাতির। তিরিশ পেলে অপদার্থ। চাকর বাকর।

খাস্তা কচুরি আর জিলিপি দুটোই আমার খুব প্রিয়। প্রচণ্ড ক্ষিদে। জিভে জল এসে গেছে; কিন্তু আমি খাবো না। আমার খাবার অধিকার নেই। এ-সব বড় লোকের খাদ্য। এ-সব খেতে হলে মানুষকে অনেক টাকা রোজগার করতে হয়। অনেক টাকা রোজগার করতে হলে লেখাপড়ায় ভীষণ ভাল হতে হয়, বা বিশাল বড় ব্যবসায়ী হতে হয়। জ্যাঠামশাই কত ভালবেসে নিজে গিয়ে কিনে এনেছেন। ছুঁড়ে পাশের মাঠে ফেলে দিতেও প্রাণ চাইছে না। কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় জ্যাঠামশাই ছাতে উঠে এলেন। পরিষ্কার শুভ্র এক মানুষ, পায়ে ভেলভেটের চটি। উল্টে আঁচড়ানো কাঁচাপাকা চুল। ভগবানের মতো সুন্দর মুখ।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি জানতুম তুমি খাবে না। বাপ-মায়ের কথায় অভিমান করতে আছে?'

খাওয়া তুলে, শরীর তুলে, ঘুম কি চান তুলে কথা বললে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আমি তো লেখাপড়ায় ভাল হবার কত চেষ্টা করছি! প্রাণপন চেষ্টা। রাতে সামান্য একটু ঘুমোই, তাও যদি সব বলে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে আর মোষের মতো শরীর বাগাচ্ছে তাহলে কেমন লাগে!

জ্যাঠামশাই জোর করে আমার মুখে একটা কচুরি ঢুকিয়ে দিলেন। আমার চোখে জল এসে গেল। জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমার বাবা তো আমাকে উঠতে বসতে গালাগাল দিতেন। ভাইটা তো লেখা-পড়ায় ভীষণ ভাল ছিল। কোনও পরীক্ষায় সেকেণ্ড হত না। তার ফলে আমার গঞ্জনা আরও বেড়ে যেত। আমি ছিলুম ঠিক তোমার মতো। অনেকটা বয়স পর্যন্ত শিশুর মতো। পেকে ঝানু হতে আমার যে কত বছর লেগেছিল। আজও ঠিক ঠিক হতে পারিনি। আমার অত উচ্চকাঙ্ক্ষাও নেই। হেসে খেলে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। এই একটু গান শুনলাম, আপন মনে বাথরুমে একটু

নেচে নিলুম, যখন যা জুটলো খেয়ে নিলুম। কি আছে বাবা! এতো দোদিনকা মেলা! আজ হিঁয়া তো কাল হুঁয়া।'

জ্যাঠামশাই হাত তুললেন আকাশের দিকে।

আমি বললুম, 'আপনি কিন্তু এম. এ তে ফার্স্ট ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছিলেন।'

'আহা, সে সাবজেক্টটা আবার কি দেখো! ফিলজফি। মেয়েদের সাবজেক্ট।'

'আপনি ম্যাট্রিকে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন।'

'সে পেতে পারি। তা বলে তো তোমার বাবার মতো ফার্স্ট হতে পারিনি। খবরের কাগজে ছবিও ছাপা হয়নি।'

জ্যাঠামশাই কোচার খুঁট দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলুম।

'হঠাৎ প্রণাম।'

'এমনি, ইচ্ছে হল তাই।'

ছাতের আলসেতে গোটাকতক লোভী কাক এসে বসেছে। জ্যাঠামশাই একটা কচুরি ভেঙে ছড়িয়ে দিলেন চারপাশে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কাক কী জিলিপি খায়?' তারপর নিজেই বললেন, 'খাবে না কেন? কাক হল সর্বভুক।' একটা জিলিপি টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেন। কাকগুলোর কি আনন্দ! আমি কি যে খাচ্ছি বুঝতেই পারছি না। জ্যাঠামশাই পাছে কিছু মনে করেন তাই গিলে যাচ্ছি।

ঠোঙাটা জঞ্জালের গাদায় ফেলে দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, 'চলো এবার আমরা দু'জনে কোমর বেঁধে লেগে যাই। তোমার বাবাকে বলে দেবো এবার থেকে আমি পড়াবো। দেখি কিছু হয় কি-না।'

জ্যাঠামশাই নিচে নেমে এসে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'আমরা পড়তে বসছি। আমাদের কেউ কোনও ডিস্টার্ব করবে না।'

সবাই এ-পাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে, আমাদের কথায় খুব একটা কান দিল বলে মনে হল না। জ্যাঠামশাই এত

ভাল মানুষ, যে তাঁর থাকা, না-থাকা প্রায় একই কথা। কেউ সম্মান করে না, আবার অসম্মানও করে না। জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে আমার ভীষণ দুঃখ হয়। আমার জ্যাঠাইমা ছিলেন দেবীর মতো। মা দুর্গার মতো। আমার জ্যাঠাইমাকে বাবা ভীষণ সম্মান করতেন। তিনি চলে গিয়ে আমার সব চলে গেছে। বাড়িটায় আর কোনও সুখ নেই।

পড়ার টেবিলে বসে জ্যাঠামশাই অঙ্কের ওপর একটা বক্তৃতা দিলেন। অঙ্ক কাকে বলে? 'শোনো অঙ্ককে আগে ভেঙে নিতে হয়। অঙ্ক হল শত্রু। একটু দূর থেকে দেখে নিতে হয় শত্রু সমাবেশ। কে কোথায় কিভাবে আছে! তারপর আক্রমণ করো পেনসিল নিয়ে। কচ কচ করে কেটে ফেলো যত রহস্য, যত ধাঁধাঁ। অঙ্ক এক ছদ্মবেশী শয়তান। গোঁফ, দাড়ি, পরচুল পরা এক অভিনেতা। সব টেনে টেনে খুলে ফেলো দেখবে সহজ সরল, সেই দুই আর দুইয়ে চার। শত্রু না ভাবলে কারোকে আক্রমণ করা যায় না। বন্ধু ভেবেছো কি মরেছো। নাও প্রথম অঙ্কটা শুরু করো।'

জ্যাঠামশাই দর্শনে সুপণ্ডিত। কুচকটালে অঙ্ক তাঁর পক্ষে সামলানো কি সহজ! এদিক থেকে ওদিক থেকে নানা দিক থেকে তিনি অঙ্কটাকে আক্রমণ করলেন। তিনটে পাতা সংখ্যায় সংখ্যায় ভরে গেল। কিম্ভুতকিমাকার সব উত্তর বেরলো। শেষে খুব করুণ মুখে বললেন, 'অনেক দিন চর্চা নেই তো, সবই প্রায় ভুলে গেছি। তোমার জন্যে আবার সব ঝালাতে হবে। এসো আমরা আর্টস সাবজেক্ট পড়ি।'

আমাদের ঘরের সামনে দিয়ে বাবা গটগট করে হেঁটে গেলেন। ফিরেও তাকালেন না। মনে মনে বললুম, একবার দেখে গেলে পারতেন। আর হয় তো দেখা হবে না, কোনও দিন। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে জল এসে গেল। মন ধমকে উঠল। এত মন খারাপ হলে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে না। সন্ন্যাসীদের মন হওয়া উচিত ইস্পাতের মতো।

জ্যাঠামশাই দশটা নাগাদ বেরিয়ে গেলেন। এইবার আমার খেলা। আমার টিনের সুটকেসে পঞ্চাশটা টাকা জমেছে। অনেক দিন ধরে একটু একটু করে জমিয়েছি। আমি একটু কৃপণ মতো আছি। সহজে খরচ করি না। টাকাটা আজ আমার কাজে লেগে যাবে। সঙ্গে আর কিছু নেওয়া যাবে না। নিলেই সব সন্দেহ করবে। বড় বড় সন্ন্যাসী যাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁরা সব এক বস্ত্রেই গৃহত্যাগ করেছেন। এ তো আর চেঞ্জে যাওয়া নয়।

ভালো করে চান করলুম। বাথরুমটাকে ভাল করে দেখে নিলুম। আর তো দেখতে পাবো না। এই জায়গাটা সারা বাড়ির মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। ঠাণ্ডা। শান্ত। বসে বসে অনেক কিছু ভাবা যায়। বাথরুম থেকে বেরিয়ে মোটামুটি পরিষ্কার একটা জামা আর ট্রাউজার পরলুম। বেশি সাজগোজ চলবে না। আমি তো আর বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি না! আজ সবচেয়ে বড় সুবিধে আমাকে সবাই বয়কট করেছে। আরও সুবিধে, আজকের কাগজে খবর আছে, বিশু নেহরু প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সারা ভারতের মধ্যে প্রথম হয়ে রাশিয়া যাচ্ছে। সেই নিয়ে বিশুর গুণগানে বাড়ি একেবারে ফেটে যাচ্ছে। সব কথারই শেষ কথা বিশুকে ছ্যাখো আর আমাদের অপদার্থটাকে ছ্যাখো।

ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম করলুম। আমার জ্যাঠাইমার বড় ছবিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। জ্যাঠাইমাই আমাকে পথ দেখাবেন। যে-দিক দিয়েই হোক বড় আমাকে হতেই হবে। এমন বড় যে খবরের কাগজে ছবি বেরোবে। মানুষ আমাকে মনে রাখবে মৃত্যুর পরেও। জন্মদিন পালন করবে। আড়াল থেকে মাকে একবার দেখে নিলুম। আমার মাটা মানুষ হিসেবে ভীষণ ভালো, তবে নিজের কোনও মত নেই। আর সবেতেই ভীষণ চিৎকার করে। সারাটা দিন হইহই করছে। করছে তো করছেই। আমার মাটার মনে কোনও প্যাঁচ নেই। নাচালেই নাচে। মুখ আলগা, দিল খোলা। সবাই তাই বলে। মা দেখি একপাশে বসে

চুলের জট ছাড়াচ্ছে আর আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে তার সঙ্গে বকবক করছে। আমি মনে মনে মাকে বললুম, 'মা বিদায়।' আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না মা। তোমার জন্যেই আমার মনটা খারাপ হবে। আমাকে যতই তুমি গালাগাল দাও, তুমি আমাকে ভালবাসো। কাল অনেক রাতে তুমি যখন মশারি তুলে আমার মাথায় হাত রাখলে, তখন তুমি ভেবেছিলে আমি ঘুমোচ্ছি। আমি কিন্তু জেগেছিলুম। তুমি আঙুল দিয়ে আমার চোখের দুটো কোণ দেখলে, আমি কেঁদেছি কি না। আমি আর বাইরে কাঁদি না, কাঁদি ভেতরে। আমি যে বড় হচ্ছি মা। ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা দিয়েছে। আমি শুনছিলুম, তুমি বলছ, 'কেন বাবা, একটু ভাল করে লেখাপড়া করিস না। তুই যে আমাদের বংশের একমাত্র বাতি!' জানি মা; কিন্তু কি করবো বলো? মানুষের মতো দেখতে হলেও আমি একটা গাধা। তবে তোমাকে আমি বলে যাচ্ছি, ভাল ইঞ্জিনিয়ার হতে না পারি, ভাল সন্ন্যাসী আমি হবোই। আসি মা।'

চোখ দুটো অল্প অল্প জ্বালা করছে! একটু, খুব একটু জল এসেছে। আসুক গে! মন দুর্বল হলে চলবে না। আমি পুরুষ, আমাকে লড়াই করে বাঁচতে হবে। কেমন? দরজার পাশে থুপ্পিমেরে বসেছিল আমার গেরুয়া রঙের বিড়ালটা। এই বাড়িতে ওকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। পুষিও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সে ভালবাসার কোনও তুলনা হয় না। মনখারাপ করে বসে থাকলে ও এসে আমার গায়ে মোটা চামরের মতো লেজটা বোলাতে থাকে। ঘড়ঘড় করে। গায়ে গা ঘষে। শেষে কোলে উঠে শুয়ে পড়ে।

বেড়ালটাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের লোহার গেটটা খুলে বেরিয়ে এলুম রাস্তায়। মনে মনে বললুম, 'বাড়ি, তুমি রইলে। তুমি থাকো। অনেক অনেক দিন থাকো। আমি যখন বড় হবো, আরও বড়, ধরো আজ থেকে চোদ্দ বছর পরে, আমি এসে একবার দেখে যাবো। জানি না তখন কে থাকবে আর না থাকবে! বাবা, মা,

জ্যাঠামশাই। আমার পুষিটা তো থাকবেই না। ছাতের টবের গাছগুলো সব মরে যাবে। মেলা থেকে অনেক পুতুল কিনেছিলুম, সেগুলো ওরা সব অযত্ন করে ফেলে দেবে। আমার পড়ার বই, গল্পের বই, খাতা, কলম হয় তো কারোকে দিয়ে দেবে। থাক গে, সে যা হয় হবে। বাড়ি তুমি রইলে, আমি চললুম।'

ভাই বোনের তেলেভাজার দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালুম। বোনকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। ছিপছিপে পাতলা চেহারা। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রঙ। চোখ দুটো টানাটানা। এই অ্যাতো বড় বড় চোখের পাতা। মণি দুটো কুচকুচে কালো। হরিণের মতো। ঠোঁট দুটো পাতলা কাগজের মতো। লম্বা, লতানে হাত। মুখে সব সময় একটা হাসি লেগে আছে। হাসার সময় চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে গিয়ে এত সুন্দর দেখায়! মিষ্টি কথা; যেন শিশির ঝরে পড়ছে। আমাকে ভগবান যদি অমন একটা বোন দিতেন আমার আর কোনও দুঃখ থাকত না। আমি সেতার বাজাতুম সে নাচত। আমার জমানো পয়সায় তাকে আইসক্রিম খাওয়াতুম। ভোরে তার জন্যে তুলে আনতুম চাঁপা ফুল। চাঁদিনী রাতে দু'জনে নৌকো করে গঙ্গায় বেড়াতুম। আজ সে একটা নীল ডুরে শাড়ি পরেছে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বললে, 'স্কুলে যাবে না?'

'যাচ্ছি তো।'

'বই নিলে না?'

মিথ্যে মিথ্যে বললুম, 'আজ আমাদের পরীক্ষা।'

'বিকেলে আসবে তো! আজ আমরা রোল তৈরি করবো।'

'আসবো।'

কি জানি কেন মনে হল ওকে একটা কিছু দিয়ে গেলে বেশ হয়, কোনও উপহার। আমার কাছে তো কিছু নেই। সামান্য কয়েকটা টাকা আছে। একটা জিনিস আছে, আমার আঙুলে আমার পইতের আংটিটা। যে সন্ন্যাসী হবে, তার আঙুলে আংটি থাকা উচিত নয়। মেয়েটির নাম তৃষা।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম, খুব আস্তে, 'তৃষা একবার আসবে। খুব একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। এক মিনিট।'

দোকানে তেমন ভীড় নেই। তৃষা বেরিয়ে এল। 'একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললুম, 'তুমি আমার একটা জিনিস তোমার কাছে রাখবে?'

'কি জিনিস?'

'আমার এই আঙটিটা।'

'আঙটি? আঙটি কেন রাখবো! সোনার আঙটির কত দাম?'

'রাখো না তৃষা। আমি ভুলে পরে চলে এসেছি। আর ইচ্ছে করছে না বাড়ি যেতে। তোমার আঙুলে এখন রেখে দাও।'

তৃষা হ্যাঁ না কিছু বলার আগেই আঙটিটা তার সরু চাঁপার কলির মতো আঙুলে ঢুকিয়ে দিয়েই আমি হন হন করে হাঁটা দিলুম। আর কোনও দিকে তাকাতাকি নয়। একটা বাস আসছিল। উঠে পড়লুম। আমার ভেতরে বেশ একটা গতি এসে গেছে। আমি চলার আগেই ভেতরটা চলতে শুরু করছে। বাসে এদিক-ওদিক কারোর দিকে বেশি তাকালুম না। বলা যায় না, চেনাশোনা কারোর সঙ্গে যদি হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে যায়, অমনি চেপে ধরবেন, তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস পিণ্টু? তোর স্কুল নেই? বাসে যা ভিড়! সবাই গুঁতোগুঁতিতেই ব্যতিব্যস্ত। আমার মতো পুঁচকেটার দিকে কে আর তাকায়। চেনা অনেকেই; কিন্তু কে আর কাকে চিনছে এখন! লড়াই চলেছে, লড়াই। জায়গার লড়াই। দমকে দমকে কাশির মতো, দমকে দমকে ঝগড়া। কি ঝগড়াই যে করতে পারে মানুষ, কত ভাবে! কুকুরকেও হার মানায়! এক বৃদ্ধ আমার পিঠে মোক্ষম একটা গুঁতো মেরে বললেন, 'এই ছোঁড়া ভেতরে যা!' ছোঁড়া বলা, তার সঙ্গে তুই-তোকারি, এমন রাগ হচ্ছিল! তারপরে ভাবলুম, পথে নেমেছি চিরকালের জন্যে, সেই গানটার মতো, পথেই জীবন, পথেই মরণ আমাদের, মাথা গরম করলে চলবে না। সত্য কথা বলতে কি, নিজেকে এখন বেশ বড় বড় লাগছে। বাস অনেকটা দূর

চলে এসেছে। এতটা পথ কেবল তৃষার কথাই মনে পড়ছে। মা নয়, বাবা নয়, জ্যাঠামশাই নয়। তৃষা মনে হয় আগের জন্মে আমার কেউ ছিল! আর একটা কথা কি, যারা ঘৃণা করে তাদের দিকে ঘৃণাটাই তেড়ে যায় বাঘের মতো।

ভিড় থকথকে স্টেশান। চারদিকে ঘ্যাচোরম্যাচোর। ফুটকড়াইয়ের মতো মানুষের ছড়াছড়ি। টিকিট কাটার সারসার খুপরি। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলুম। কোন ট্রেন, কোথাকার টিকিট! পকেটে মাত্র পঞ্চাশটা টাকা। ঠিক করলুম, তিরিশ টাকার মধ্যে যতদূর যাওয়া যায়, ততদূর যাবো। এখন যদি বলি তিরিশ টাকার টিকিট দিন, সন্দেহ করবেন।

একটা জায়গার নাম লেখা রয়েছে ধানবাদ। নামটা শোনা শোনা। ধানবাদ মানে ধন্যবাদ। কিনে ফেললুম টিকিট। একটু পরেই ট্রেন ছাড়বে। অনেক আগে আমাদের স্কুল থেকে ট্রেনে চাপিয়ে একবার দার্জিলিং বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। তখন কোনও ভয় করেনি। গোটা কামরা জুড়ে আমরা সবাই ছিলুম। সারা রাত গান আর গল্প। এখন আমি একা। এত বড় একটা ট্রেন। কামরার পর কামরা। প্রচুর লোক। নানা রকমের লোক। হঠাৎ দেখি, আমাদের বাড়ির উল্টো দিকের বিধানবাবু হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে হনহন করে আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন, প্রায় আমাকে ঠেলা মেরে। বুকটা ধক্ করে উঠল। চিনে ফেললেই মুশকিল। পরে বুঝলুম, মানুষ যখন নিজের ধান্দায় থাকে, তখন কেউ কারোকে চিনতে পারে না। বিধানবাবু চলে গেলেন ট্রেনের শেষ কামরাটার দিকে।

আমি একটা আধখালি কামরায় উঠতেই বৃদ্ধ মতো এক ভদ্রলোক, চাকরবাকরকে যেভাবে বলে, সেইভাবে বললেন, 'আরে, আরে এটা ফার্স্টক্লাস, ফার্স্টক্লাস।'

আমার ভীষণ খারাপ লাগল, ভদ্রলোক জানেন না, আমি বড় না হতে পারি আমার বাবা কত বড়! আমি আমার সেই বড়বাবার এক মাত্র ছেলে। আমাকে ফার্স্টক্লাস চেনাচ্ছেন ভদ্রলোক!

বড়লোকেরা ভীষণ ছোট লোক হয়! ভালভাবেই তো বলতে পারতেন! মানুষের একটু ক্ষমতা আর পয়সা হলেই, বিশ্বের সব মানুষকে ভিখিরি মনে করেন। কে জানে কোথাকার কে ; কামরায় যে-কজন রয়েছেন সকলকেই কেমন যেন তেএঁটের মতো দেখতে! অহঙ্কারে সব মটমট করছে। দাঁড়াও, আমারও দিন আসবে! আসবেই আসবে। তখন আমি গোটা একটা ট্রেন ভাড়া করে ভারত ঘুরতে বেরবো।

একটা ছুই লেখা কামরায় উঠে একটু বসার জায়গা পেয়ে গেলুম। আমার পাশে হাসিখুশি চেহারার এক ভদ্রলোক। বেশ স্বাস্থ্যবান। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ছোট করে কাটা এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। ঝকঝকে চোখ। ঝকঝকে দাঁত। এইমাত্র যেন ঈশ্বরের বাগান থেকে তুলে আনা হয়েছে। ভদ্রলোক নিজেই সরে গিয়ে আমার হাত টেনে বসালেন। গুনগুন করে গান গাইছেন, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণতলে। ভদ্রলোক কেমন যেন একটা আনন্দের মধ্যে রয়েছেন। আমি যতটা সম্ভব ছোট হয়ে বসলুম।

ট্রেন দুলতে শুরু করেছে। ভদ্রলোকের কাঁধে আমার কাঁধ ঘষে যাচ্ছে। তিনি পকেট থেকে দুটো লজেন্স বের করে একটা আমার হাতে দিলেন, 'নাও, লজ্জা কোরো না। ট্রেনে লজেন্স খেতে হয় তা না হলেই মন খারাপ লাগে। ট্রেন তো আমাদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়, এই যে চলে যাওয়া, এইটাই বুঝলে কি না ভীষণ দুঃখের!'

তিনি নিজের লজেন্সের কাগজটা খুলছেন আর গুনগুন করছেন, না, যেও না, রজনী এখনও বাকি বলে রাত জাগা পাখি। বসে আছেন, জানালার ধারে। পাতলা কাগজটা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন যত দূর দেখা যায়। গলাটা টেনে নিয়ে বললেন, 'প্রজাপতির মতো কেমন উড়ে গেল!'

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'না কাজটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না।'

আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলুম, কি রে বাবা। ভদ্রলোক আমার ভেতরটা দেখতে পেয়ে গেছেন না কি! আমি কে? যাচ্ছি কোথায়? দম বন্ধ করে বসে আছি। ট্রেনটা ঝাঁ ঝাঁ করে ছুটছে।

ভদ্রলোক কথাটা এইবার শেষ করলেন, ছোটদেরই জানালার ধারে বসা উচিত। তুমি চলে এসো আমার জায়গায়। তুমি যাবে কোথায়?'

'আজ্ঞে ধানবাদ।'

'বাঃ ভেরি ফাইন। অনেকটা পথ। চলে এসো।'

আমি জানালার ধারে চলে গেলুম, তিনি সরে এলেন আমার জায়গায়। ভদ্রলোক তখন গুনগুন করছেন আর একটা গানের লাইন, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। হঠাৎ গান থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি যাবে কোথায়?'

'ধানবাদ।'

'আঃ, ডবল ফাইন। আমারও ধানবাদ। তা ধানবাদের তুমি কোথায় যাবে?'

মহা সমস্যা। কি উত্তর দোবো? ধানবাদের তো কিছুই আমি জানি না। হে ঈশ্বর রক্ষা করো। চোখ কান বুজিয়ে বলে দিলুম, 'কালীবাড়ির কাছে।' কালীবাড়ি একটা থাকবেই থাকবে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ট্রিবল ফাইন। সিদ্ধেশ্বরীতলাতেই তো আমার বাড়ি। একেবারে কালীবাড়ির গায়ে। তুমি কার বাড়িতে যাবে?'

এইবার আরও শক্ত প্রশ্ন। এ যেন না পড়ে পরীক্ষায় বসা। কি উত্তর দেবো! যা থাকে বরাতে। হুম করে বলে দিলুম, 'কে. সি. মিত্রের বাড়িতে।'

'কে. সি. মিত্র? কোল করপোরেসানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। সেও তো আমার বাড়ি পেছনে। বলতে গেলে তুমি তা হলে আমার বাড়িতেই যাচ্ছ!'

কথা শেষ করেই ভদ্রলোক আবার গুনগুন শুরু করে দিলেন,

মায়াবন বিহারিনী হরিণী। আমি শুধু অবাক হয়ে গেলুম, না পড়েও তাহলে পরীক্ষায় পাশ করা যায়। ট্রেন চলেছে আর আমি ভাবছি, সেই কলটা তা হলে কি কল? মনের চোখে দেখতে পাওয়া। ভীষণ একটা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে মনকে দিয়ে দেখানো। ওই তো ধানবাদ স্টেশান। বেরিয়ে এলুম। সামনে একটা চত্বর মতো। তারও পরে রাস্তা। ডানদিকে রিকশা নিয়ে এগিয়ে চলেছি। না দেখা জায়গাটা ছবি হয়ে ফুটে উঠছে মনের চোখে।

আমাদের সামনের আসনে এক বৃদ্ধ। সমস্ত চুল একেবারে ধপধপে সাদা। পাঞ্জাবিটা একেবারে টাইট ফিটিং। তার পাশে দুটি মেয়ে জানালার দিকে, তৃষার বয়সী। যে তৃষা তেলেভাজার দোকানে, সেই তৃষাই যেন দু'খণ্ড হয়ে আমার সামনে ট্রেনের আসনে। আমি ভদ্রলোককে দেখছি আর ভাবছি, কাচার পর পাঞ্জাবীটা ছোট হয়ে গেল, না মানুষটা মোটা হয়ে গেল! একেই কি গবেষণা বলে! এই গবেষণা করেই কি ডি. ফিল পায়! মেয়ে দুটি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। চুল সব পেকে গেলেও মানুষটি জওয়ান। হাঁটুর ওপর সেদিনের কাগজ। অবাক হয়ে গেলুম ভদ্রলোক দুইয়ের পাতাটা খুলে নিরুদ্দিষ্টদের ছবি দেখছেন আর আমার দিকে আড়ে আড়ে চাইছেন। ভারি সন্দেহবাতিক তো ভদ্রলোকের! তেমনি বোকা, আমার চেয়েও বোকা। আজ যে নিরুদ্দেশ হল, আজই তার ছবি কাগজে বেরোয় কি করে! ভদ্রলোক তাঁর পাশের মেয়েটিকে একটা ছবি দেখালেন। দু'জনে ফিসফিস করে কথা হল। মেয়েটি ঝলকে আমাকে একবার দেখে নিল। আবার ফিসফিস। ভদ্রলোক কাগজ মুড়ে রাখলেন।

আমার পাশের ভদ্রলোক আবার দুটো লজেন্‌স বের করলেন, 'বুঝলে নিয়মটা হল, একটা লজেন্‌স শেষ হয়ে যাবার পর দশ মিনিট গ্যাপ, তারপর আর একটা। তোমার কতক্ষণ আগে শেষ হয়েছে?

'অনেকক্ষণ।'

'সে কি, অনেকক্ষণ মানে? তুমি চিবিয়ে ফেলেছ না কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিক জানি, তুমিও ওই শতকরা নিরানব্বইয়ের দলে। শেষপর্যন্ত চুষে খাবার ধৈর্য নেই। কিছুক্ষণ চুষেই কড়র মড়র। নাও ধরো। এটা আর চিবোবে না।'

তিনটে খুব বাজে ধরনের ছেলে ভীষণ অসভ্যতা করছিল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তাদের লক্ষ্য যতদূর মনে হল আমাদের সামনে বসে থাকা ওই মেয়ে দুটি। যাতা গান গাইছে। সিটি দিচ্ছে। বাজে বাজে কথা বলছে। সকলেই বেশ ভদ্রলোকের মতো জামাকাপড় পরেছে। পরলে কি হবে! খোলশটা ভদ্র আর পুরটা অভদ্র। নালানর্দমার মতো। কামরায় অত যাত্রী কেউ কিন্তু কিছু বলছেন না। সব মুখ বুজিয়ে সহ্য করে নিচ্ছেন।

আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'তোমর নামটা কি?

'পিণ্টু।'

'তাই না কি? আমার ভাইয়ের নামও পিণ্টু ছিল। কি আশ্চর্য! আমার ডাক নাম কি বলো তো? বিল্টু। তুমি আমাকে বিল্টুদা বোলো। তার মানে কি বলোতো? আমি যেন আমার ভাইকে ফিরে পেলুম। তোমাকে প্রায় পিণ্টুর মতোই দেখতে। সেই পিণ্টুর মতো। আসলে কি জানো, নামের সঙ্গে চেহারা মিলে যায়। যেমন ধরো, একশোটা বিল্টুকে পাশাপাশি দাঁড় করাও, দেখবে চেহারা আর স্বভাবে অনেক মিল। কেন হয়, কিভাবে হয়, তা আমি বলতে পারবো না, আমি সেরকম পণ্ডিত নই।'

ওই ছেলে তিনটে হঠাৎ খুবই একটা যাচ্ছেতাই কথা বললে। আমার উল্টোদিকের মেয়ে দুটি ফিসফিস করে বললে, 'বাবা শুনছো?'

'কান দিস নি। বাজে ছেলে।'

বিল্টুদা ধীরে ধীরে উঠলেন, আমি একটু হাল্কা হয়ে আসি।'

তিনি উঠে যাওয়া মাত্রই ওই তিনটে ছেলের মধ্যে যেটা পালের গোদা সেইটা এসে বসে পড়ল। আমি বললুম, 'এ কি? আমার দাদার জায়গা।'

ছেলেটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল, 'জায়গা তোর বাপের।'

আমার মনে হচ্ছিল ঝেড়ে দি স্ট্রেট একটা ঘুসি তারপর যা হয় হবে। মানুষ তো নেই সব ভেড়া। বিল্টুদা ফিরে এলেন সাদা রুমালে হাত মুছতে মুছতে। ট্রেন ছুটছে দুলে দুলে। রুমালটা পকেটে পুরে ছেলেটাকে বললেন, 'ওঠো, ওঠো, উঠে পড়।'

ছেলেটা বললে, 'ওঠো কি! আপনি বলুন।'

বিল্টুদা বললেন, 'তুমি এখন ওঠো তো।'

'দাঁড়িয়ে থাক, দাঁড়িয়ে থাক। অনেকক্ষণ বসেছিস।'

বিল্টুদার ডান হাতটা বিদ্যুতের মতো ছুটে এল ছেলেটার চোয়ালের দিকে। নিমেষে ঘটে গেল ঘটনাটা। ক্র্যাক্ করে একটা শব্দ হল। ছেলেটার নিচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। বিল্টুদা তার চুলের মুঠিটা ধরে সিট থেকে টেনে তুলে প্যাসেজের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, 'যাঃ, গুরুকে এখন তিন মাস শুইয়ে রাখ। তিন মাসের আগে ও চোয়াল আর মেরামত হবে না।'

ছেলে দুটোর একটা তেড়ে আসছিল। বিল্টুদা ডান পা দিয়ে কি একটা করলেন ছেলেটা কাটা কলাগাছের মতো উল্টে পড়ে গেল তো গেলই। আর ওঠে না। তিন নম্বর ছেলেটাকে বললেন 'এসো ওস্তাদ প্রসাদ নিয়ে যাও।' ছেলেটা বললে 'পরের স্টেশানে মজা দেখাবো!'

বিল্টুদা বললেন, 'মজা তো আমি দেখাবো। জি. আর. পির হাতে তুলে দেবো ডাকাত বলে। তার আগে তোমার হাতের খিল দুটো খুলে দেবো। এক সেকেণ্ডের ব্যাপার। গুরুর চোয়াল খুলেছি, চ্যালার হাঁটু খুলেছি, আর এক চ্যালার কাঁধ খুলে দেবো। সামান্য কাজ। তার জন্যে এত ঝামেলা।'

ছেলেটা ঘাবড়ে গেল। ট্রেনের গতি কমছে। স্টেশান আসছে। বিল্টুদা উঠে দাঁড়ালেন, 'পিন্টু, তুমি বোসো আবর্জনা তিনটেকে ফেলে দিয়ে আসি, স্লো মোশানেই ফেলবো। লাইনের খোয়ার ওপর একটু বিশ্রাম নিক, আহা অনেক খিস্তি করেছে।'

বিল্টুদা তৃতীয় ছেলেটার কাঁধে হাত রেখেই হাত তুলে নিলেন। ছেলেটা বাবা'রে বলে উঠল। দুটো হাত লটপট। বিল্টুদা বললেন, 'কিছুই হয়নি ভাই। সঙ্গ দোষ বড় দোষ। এরপর আরও ভয়ঙ্কর কিছু হবে। চলো এইবার তোমাদের একে একে ফেলি।'

দ্বিতীয় ছেলেটা হাত জোড় করে বললে 'এবারকার মতো ক্ষমা করে দিন স্যার।'

'ক্ষমা তো করেইছি ভাই। একবারে তো ঝলঝলে করে দিই নি। এইবার তোমাদের নামিয়ে দি। মানুষকে সাহায্য করাই মানুষের ধর্ম।'

'আমরা যে আরও অনেক দূর যাবো স্যার?'

'নাঃ আর যায় না। আগে নিজেদের একটু মেরামত করে নাও।'

ট্রেনের গতি প্রায় কমে এসেছে। জামার পেছন দিকের কলার ধরে এক একটাকে তুললেন, বেড়াল ছানার মতো ঝুলছে। দরজা খুলে ফেলে দিলেন বাইরে, যেন বসিয়ে দিলেন আলতো করে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'কাজটা ঠিক হল না, যদি দল বেঁধে আক্রমণ করে?'

বিল্টুদা বললেন, 'আপনাকে আমার অনুরোধ মেয়েদের নিয়ে ভবিষ্যতে বেরোবার আগে নিজে মানুষ হবেন। গরু, ভেড়া, ছাগলও প্রতিবাদ করে। শিং দিয়ে ঢুঁ মারে, কেবল মানুষই মুখ বুজে সহ্য করে। কাওয়ার্ড কোথাকার। এতগুলো লোক একবারও প্রতিবাদ করলেন না। সব মজা দেখছিলেন, মজা।'

কিছুই হল না, ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। বিল্টুদা লজেন্স বের করলেন। বললেন 'খামোখা খানিকটা সময় নষ্ট হল। কোনও মানে হয়। শোনো পিন্টু দিনকাল খুব বাজে পড়েছে। শুধু লেখাপড়া শিখলেই হবে না, মার্শাল আর্টও শিখতে হবে। তিনটে জিনিস কি কি ছাড়লুম বলো তো-ক্র্যাক জ্যাক, লেগ ব্রেক আর প্লেকসি ফ্লেকস। তুমিও এসব শিখবে তা না হলে কেঁচোর মতো বাঁচতে হবে।' বিল্টুদা গুনগুন গান ধরলেন, বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা।

ধানবাদ স্টেশান এসে গেল। আমরা দু'জনে নেমে পড়লুম। এইবার আমার সমস্যা! সব মিথ্যে ধরা পড়ে যাবে রে ভাই। বিল্টুদা বললেন 'এ কি তোমার সঙ্গে কোনও মালপত্র নেই, না ভুলে ট্রেনে ফেলে এলে?'

বিল্টুদার একটা হাত আমার কাঁধে আর এক হাতে সুটকেস।

'আমার সঙ্গে কিছু নেই।'

'কে. সি. মিত্র তোমার কে হন? মামা! আমার সঙ্গে ভীষণ আলাপ। জানো তো ওঁর তিনটে অ্যালসেসিয়ানকে আমিই ট্রেনিং দিয়েছি। আচ্ছা একটা কথা মনে হচ্ছে, এতদিন ওই বাড়ির সঙ্গে আমার যোগাযোগ তোমাকে তো এর আগে কোনও দিন দেখিনি। কেন বলো তো?'

আর আমার মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বিল্টুদাকে আমার ভীষণ, ভীষণ ভাল লেগে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, সন্ন্যাসী না হয়ে বিল্টুদা হওয়াই ভালো। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি সুন্দর ব্যবহার, তেমনি সাহস আর আত্মবিশ্বাস?

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। বিল্টুদা বললেন, 'কি হল? জল খাবে? জলখাবার?'

'বিল্টুদা, আপনার সঙ্গে আমার খুব একটা প্রাইভেট কথা আছে। যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করেন তাহলে বলবো। কোথাও একটু বসবেন?'

বিল্টুদা কেমন যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন, বললেন, 'চলো তাহলে, মুলচাঁদের দোকানে বসি। হ্যাঁ গো তুমি পালিয়েটালিয়ে আসো নি তো, বাপ-মায়ের বুক খালি করে! তাহলে কিন্তু খুব অন্যায় করেছ।' মুলচাঁদ কচৌরিঅলার দোকানে আমরা বসলুম পাশাপাশি। বিল্টুদার দেখি ভীষণ খাতির। ইয়া বড় বড় গেলাসে এসে গেল দু'গেলাস জল। কিছু বলতেই হচ্ছে না, এসে গেল দু'প্লেট গরমাগরম কচুরি।

'নাও খাও। উঃ সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। পেটে যেন ডাকাত পড়েছে। হ্যাঁ বলো, তোমার কথা বলো।'

'দেখুন আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। আমার দাদা নেই মনে হচ্ছে সত্যিই আপনি আমার দাদা। আপনাকে আমি যা বলবো, তা শুনে আমাকে আপনি পুলিশের হাতে তুলে দেবেন না বলুন? প্রমিস।'

'প্রমিস।'

আমি তখন সব খুলে বললুম। একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বললুম 'আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছি। কে সি. মিত্র আমার কেউ নয়। তিনি কে তাও আমি জানি না। মিছিমিছি বলেছি আর মিলে গেছে। মিথ্যে কথা বলার জন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন প্লিজ। আমি একবার যখন বেরিয়ে এসেছি আর আমি ফিরবো না, কিছুতেই না। হয় আমি সন্ন্যাসী হব না হয় আমি আপনি হব।'

'আচ্ছা তুমি আগে কচুরি খাও তারপর একটা হিসেব করতে হবে। বিচার করতে হবে।কোনও কিছু দুম্ করে করতে নেই। জীবনটা বোমা নয়। প্রথমে তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো। ধানবাদ জায়গাটা বাজে জায়গা। একা তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না পিণ্টু।'

আজকাল আর আমার সেই ছেলেবেলার মতো টাঙ্গা দেখা যায় না। সবই সাইকেল রিকশা। একজন রিকশাঅলা খুব খাতির করে এগিয়ে এল। বিল্টুদার এখানে খুব খাতির। পুরো পরিচয় এখনও আমার জানা হয়নি। জানার সময় পাইনি। রিকশা আমাদের দু'জনকে নিয়ে এগিয়ে চলল। কি রকম একটা শুকনো সাংঘাতিক জায়গা। তেমনি গরম। বিশাল বিশাল মাঠ অকারণে ছুটে চলে গেছে, টিলা পেরিয়ে, পাথর ভেঙ্গে কোথায় কে জানে। আকাশটা ধূসর। অনেক অনেক দূরে অস্পষ্ট পাহাড় আর জঙ্গল। মাঠ রয়েছে গাছ নেই। জমি ফেটে চৌচির।

বিল্টুদা বললেন ধানবাদ পুরোটাই প্রায় ফাঁপা। তলায় কয়লা খনি। আমরা ওপর থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না, তলায় আগুন জ্বলছে। খনিতে একবার আগুন লেগে গেলে সে আগুন আর সহজে

নেবানো যায় না। যুগ যুগ ধরে জ্বলে। কি নিয়ম জানো তো, কয়লা কেটে নেবার পর গাড়ি গাড়ি বালি ঢেলে গর্তটা ভরাট করা থাকে, বলে স্যাণ্ড ফিলিং। সে-সব আর ঠিক মতো করা হয় না। কয়লা দাহ্য পদার্থ। এক স্তরে আগুন ধরে গেলে আর রক্ষে নেই, সেই আগুন মাটির তলা ধরে হাঁটতে থাকে। তাকে আর বাধা দেবার উপায় থাকে না। কি মজা বলো তো! একদিন হয়তো পুরো ধানবাদ শহরটা ভুস্ করে নেমে যাবে নিচে। গভীর রাতে অনেক সময় আমরা একটা অদ্ভুত গুমগুম শব্দ শুনতে পাই। মাটির তলা দিয়ে যেন রেলগাড়ি যাচ্ছে। একবার একজন মাটি খুঁড়ছিল। যেই গাঁইতি মেরেছে মাটি ঢুকে গেল নিচে। বেরিয়ে এল আগুনের জিভ আর ধোঁয়া। লোকটা অমনি গাঁইতি টাইতি ফেলে, দে ছুট।

আমরা একটা বন মতো জায়গা পেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিলুম। বিল্টুদা বললেন, 'এই জায়গাটা বহুত খতরনক। প্রায়ই ডাকাতি হয়। এখানে ডাকাত আসে ঘোড়ায় চেপে। কি মজা! একটু বেশি রাতে এই জায়গা দিয়ে যাও না, তোমার বুক গুড়গুড় করবে ভয়ে। আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হয় স্কুটারে চেপে। আমি তখন যা স্পিড মারি না, একেবারে ঝড়।'

বিল্টুদার কথা শুনতে শুনতে মনে হল, পৃথিবীটা যেমন সুন্দর তেমন ভয়ের। একজনের ভাগ্যে যখন যা খুশি তাই ঘটতে পারে। কিছু করার নেই। সোজাপথ চলে গেছে বহুদূর। আমাদের ডান-পাশে সুন্দর একটা কলেজ পড়ল। সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি। একটু একটু বাগান। বোগেনভেলিয়ার বাহার!

বিল্টুদা বললেন, 'এইটা হল ধানবাদের পশ এলাকা। ধনকুবেরদের বসবাস। এখানে লোকের পয়সা কী! বাপ্স। টাকার বস্তা নিয়ে বাজার করতে বেরোয়। কি আর বলব তোমাকে! টাকায় অরুচি।'

'বিল্টুদা আপনিও খুব বড়লোক?'

'ধুস্। আমার দিন কোনও রকমে চলে যায়। সৎপথে কেউ

বড়লোক হয় রে ভাই ?' বিশাল জায়গা ঘেরা একটা বাড়ির সামনে বিল্টুদা রিকশাকে বললেন, 'রোকো।'

আমার তো ভয় লেগে গেল, ওরেব্বাস, এ যেন লাট ভবন। আবার খুব আনন্দও হল, এত বড় একটা বাড়িতে থাকতে পাবো। আমাদের বাড়িটা এর কাছে যেন বৈঠকখানা। জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল। লোহার চাদরের বিশাল গেট। এর নাম কোনও রকমে দিন চলা!

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে বিল্টুদা একটা বোতাম টিপলেন। দূরে একটা ঘণ্টা বাজল। কিছুক্ষণ পরে গেটের পেটে বসানো ফালি অংশটা খুলে গেল। একটা মুখ উঁকি মারল। একেবারে হিরোর মতো এক যুবক। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। নীল জিনস। টি শার্ট। যুবকটি একপাশে সরে দাঁড়াল, আমরা নিচু হয়ে ঢুকে পড়লুম। যেন তেপান্তরের মাঠ। দূরে একটা ঝলমলে সুন্দর বাড়ি। পাঁচিলের ধারে ধারে বড় বড় গাছ। আমরা দু'পা এগোতেই একপাল কুকুর ডেকে উঠল কোথা থেকে। আমি অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। বেড়াল আমি ভীষণ ভালবাসি। কুকুর দেখলেই আমার ভয় করে।

বিল্টুদা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নো ফিয়ার! সব বাঁধা আছে। তাছাড়া তুমি তো বললে সন্ন্যাসী হবে। জঙ্গলে যে বাঘও থাকে ভাই।'

'এত কুকুর আপনি পুষেছেন ?'

'ওইটাই তো আমার ব্যবসা গো। আমি ডগ ব্রিডার অ্যাণ্ড ট্রেনার। দেখবে কি মজা! কুকুর কি রকম ট্রেনিং নেয় তোমার ধারণা নেই।'

'ওরা হঠাৎ এমন ডাকছে কেন ? আমাদের চোর ভেবেছে বুঝি ?'

'ধুর পাগল! দেখছ না কেমন আদুরে গলায় ডাকছে। তিন দিন পরে আমি এলুম তো!'

কি করে বুঝলো আপনি এসেছেন ?'

'খুব সহজ! বাতাস বইছে আমাদের দিক থেকে ওদের দিকে।

সেই সঙ্গে আমাদের পায়ের শব্দ। কুকুরের দুটো সম্পদ, নাক আর কান। কানে ওরা মানুষের চেয়ে হাজার গুণ বেশি জোরে শব্দ শোনে। গন্ধ যত ফিকেই হোক ওদের নাকে লাগবেই। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে কার গন্ধ কিসের গন্ধ! তাছাড়া ওদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভীষণ প্রবল। ওরা বুঝতে পারে কে চোর কে সাধু! বুঝলে কুকুর এক আজব জীব। আমি যত মিশছি ততই অবাক হচ্ছি। মানুষ-ফানুষ আমার আর ভাল লাগে না। সবেতেই বড অশান্তি করে!'

বিল্টুদার বাড়িটা অতি সুন্দর। নিচের তলাটা একেবারে ফাঁকা। চাব চৌকো বিশাল একটা হল ঘরই বলা চলে। ছাই রঙের পাথরের মেঝে। একপাশ দিয়ে উঠে গেছে ঝুলন্ত সিঁড়ি দোতলায়। এমন কায়দার সিঁড়ি কলকাতায় বডলোকদের বাড়িতেই থাকে। লম্বা লম্বা তিন-চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আমরা সেই গ্রেট হলে ঢুকলুম। সামনের দেয়ালে বিশাল এক অয়েল পেন্টিং। সুন্দরী এক মহিলার। বিদেশিনী। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে বিল্টুদা বললেন, 'আমার স্ত্রীর ছবি। গত বছর মারা গেছেন কার অ্যাকসিডেণ্টে।'

আমার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে গেল 'ইশ'।

'ইশ বললে?'

'এত সুন্দর একজন মানুষ মারা গেলেন?'

আমার তো কেউ নয়, তবু জল এসে গেল আমার চোখে। বিল্টুদা বললেন, 'সে কি তুমি কাঁদছ! না সত্যিই তুমি সন্ন্যাসী হবে। সন্ন্যাসীদের ভিতরে খুব জল থাকে। হিমালয়ে গেলে সেই জল জমে বরফ হয়। আর বরফ মানেই ভগবান! আমার হল এই থিওরি।'

বাকি তিনটে দেয়ালে পৃথিবীর যাবতীয় কুকুরের ছবি। তলায় তলায় সব নাম লেখা। ধুসর পাথরের মেঝে সাদা দেয়াল। দেয়ালে সব রঙিন ছবি। কোণে কোণে পেতলের টবে ইনডোর প্ল্যাণ্ট। দেয়াল ঘেঁষে ঝকঝকে বসার আসন। আমার মনে হল আমি স্বর্গে এসে গেছি। এইরকম একটা জায়গার স্বপ্ন আমি মাঝেমাঝেই দেখতুম। আজ ভগবান আমাকে টেনে নিয়ে এলেন। কি মজা!

বাড়ির কথা আর মনেই পড়ছে না। আমি আর আমার মনের ভাব চাপতে পারলুম না। বলেই ফেললুম, 'কি সুন্দর!'

'আর সুন্দর, যার চেষ্টায়, পরিকল্পনায় এই সুন্দর সেই চলে গেল আর কি হবে! আমি সেই থেকে ভাবছি, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও সাধু হয়ে যাবো। আমার জীবনের গল্প শুনলে মনে হবে তোমার গল্পটা কিছুই নয়। তুমি তো আদুরে ছেলে! অতিরিক্ত ভালবাসাও এক অত্যাচার। তুমি সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে এসেছ। নাঃ বড় বেশি কথা হয়ে যাচ্ছে।'

ঝোলানো সিঁড়ির মাথার ওপর ফ্রক পরা একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। আমি তো ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছি। ভেবেছি, অয়েল পেন্টিংটাই বুঝি জীবন্ত হয়ে এসেছে। বিল্টুদা বললেন, 'আমার মেয়ে। নাম এলা। নামটা আমি রবীন্দ্রনাথ থেকে পেয়েছি।' বিল্টুদা এলাকে বললেন, 'মিট পিন্টু। কলকাতা থেকে আসছে। তোমারই ক্লাসে পড়ে। ভেরি গুড বয়।'

এলা বললে, 'তোমরা ওপরে এসো। কি করছ ওখানে অতক্ষণ? তোমরা আসছ দেখে চা বসিয়েছি। টি ইজ রেডি।'

ওপরটা আরও সাংঘাতিক সুন্দর। মেমসায়েবের বাড়ি একেই বলে। মনে হচ্ছিল আমার মাকে ডেকে এনে একবার দেখাই, সুন্দর বাড়ি কিভাবে ছবির মতো সাজাতে হয়। এলাকে দেখে আমার ভীষণ লজ্জা করছিল। তৃষার সঙ্গে আমার এমনি খুব ভাব। তৃষা আমাদের ঘরের মেয়ে। তাকে আবার লজ্জা কিসের কিন্তু এলা? বাবারে! তার জামা, তার চুল, নীল চোখ, স্লিপার, তার হাঁটাচলা, তাকাবার ভঙ্গি, কথা বলার ধরণ সবই অসাধারণ। আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলুম। মেঝেতে এত পালিশ যে চলতে গেলে পা স্লিপ করছে।

হঠাৎ এলা এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরল। মনে হল, আমি শামুকের মতো গুটিয়ে খোলে ঢুকে যাই। এলার গা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। জানি, বিলিতি সেন্টের গন্ধ। কলকাতার

নিউমার্কেটে গেলে এইরকম গন্ধ পাওয়া যায়। এলার হাত কত ফর্সা। আমারটা তেমন ফর্সা নয়। আমি মাটির দিকে চেয়ে আছি।

হঠাৎ বিল্টুদা হই হই করে উঠলেন, 'এলা, এলা, করিস কি? গায়ে হাত দিসনি। ওযে একটু পরেই সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।'

এলা ভয়ে হাত ছেড়ে দিল। বিল্টুদা হা হা করে হাসতে লাগলেন।

এলা বললে 'সন্ন্যাসী মানে?'

'সে স্টোরি পরে হবে। তুই ওকে কি করতে চাস?'

'হাত-মুখ ধোবে তো?'

'যা নিয়ে যা।'

এলা বললে 'শোনো তোমাকে আমি বাথরুম ব্যবহারের নিয়মটা শিখিয়ে দি।'

আমি এইবার অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। নীল পদ্মফুলের মতো দুটো চোখ। দুধের মতো গায়ের রঙ। মুখের চামড়া একেবারে টানটান, পাতলা। তলা থেকে একটা গোলাপী আভা ফুটছে। বাথরুম ব্যবহারের আবার নিয়ম আছে না কি?

এলা হেসে ফেলেছে। ঠিক মুক্তোর মতো একসার দাঁত। 'অবাক হলে তো! আচ্ছা আগে এই চটিটা পায়ে গলাও, তারপর এই নাও।'

দরজাটা খুলে দিল এলা। আমি তো অবাক। এর নাম বাথরুম। আয়নার মতো মেঝে। দেয়ালে দেয়ালে আয়না। কত কি জিনিস। আবার মাথার উপর পাখা। একপাশে একটা বিশাল সাদা নৌকো। তাইতে সব কল লাগানো। ওটাকে নাকি বলে বাথটাব! শুয়ে শুয়ে চান করতে হয়। হাত ধোবার বেসিন। এ-সব বাবা জীবনে দেখিনি। না আছে টিনের বালতি, না আছে মগ। না আছে শেওলা ধরা মেঝে। নিয়মটা হল মেঝেতে যেন এক ফোঁটাও জল না পড়ে। ভিজে পায়ের ছাপ না পড়ে। বেসিনে যেন সাবানের ফেনার বুজকুড়ি না থাকে।

আমি বললুম, 'এলাদিদি, আপনাদের আর কোনও বাথরুম নেই চাকরবাকরদের জন্যে!'

'দিদি নয়, আপনি নয়। এলা আর তুমি। অন্য বাথরুম থাকলেও, এইটাতেই তোমাকে যেতে হবে আর যা বললুম, তা শিখতে হবে। জানো তো মা বলতেন, বাথরুমই মানুষের চরিত্র তৈরি করে। যা-ও।'

এলা আঙুল উঁচিয়ে আমাকে আদেশ করল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে, আগে ঘুরে ঘুরে সব দেখলুম। আহা, আমার মাকে যদি দেখাতে পারতুম! যেদিকে তাকাই সেদিকেই আমি। কত আয়না! পিন্টুর দিকে পিন্টু তাকিয়ে আছে বোকার মতো। পা ধোবো কোথায়। পা দুটোর যা ছিরি। মা আমাকে মাঝে মাঝে বলেন ধাঙড়। না বাবা, কাল সকালেই এ-বাড়ি থেকে আমাকে পালাতে হবে। আমি একটা চাষা।

কনুই বেয়ে এক ফোঁটা জল মেঝেতে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়ে মুছলুম। হাঁসের পালকের মতো সাদা তোয়ালে। কোনও রকমে বেরিয়ে এসে বাঁচি। ফিনফিনে কমলালেবু রঙের চায়ের কাপে চা, প্লেটে নানা রকমের কেক। এমন কেক আমি জীবনে খাইনি। কোথায় আমার রুটি আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। এক ডেলা আখের গুড়।

বিল্টুদা বললেন, 'তুমি তো এক বস্তে গৃহত্যাগ করেছ। এইবার তোমার জামা, কাপড়ের কি ব্যবস্থা হবে!'

আমার মনে তখন অন্য প্রশ্ন। করেই বসলুম, 'আপনি এত বড়লোক, তাহলে সেকেণ্ড ক্লাসে এলেন কেন?'

'এ একটা তুমি প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করেছ? সন্ন্যাসী তো হবে, মায়া কাকে বলে জানো? ভোজবাজি? এইসব তোমার আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে। সেই শেয়ালের গল্পটা তোমাকে শোনাতে ইচ্ছে করছে।'

এলা এসে আমার পাশে বসে পড়ল, 'আমিও শুনবো বাবা।

এমন স্বাভাবিক ভাবে বসল, যেন কোনও অহঙ্কারই নেই। আমার হাতটা ধরে বললে, 'তুমি কিছু খাচ্ছ না কেন? মন খারাপ! তোমার কথা তো কিছু শোনাই হল না।'

বিল্টুদা বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। মুখটা যেন ভগবান হাসি দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন। এলাকে বললেন, 'পিল্টুর গল্প তুই পরে শুনবি। আগে ওর প্রশ্নের উত্তরটা গল্পে দি। একগ্রামে ধরো আমারই মতো এক মানুষ থাকতো। ধরো সে ছিল চাষা। যেমন আমি ছিলুম আমার অতীতে। তার চালা বাড়ির উঠনে ছিল বিশাল, বিশাল, এক খড়ের গাদা। পাহাড়ের মতো। রোজ তার মুনিশরা সেই গাদা থেকে খাবলা খাবলা খড় নিত।'

এলা বললে, 'মুনিশ কি বাবা?'

"ও হ্যাঁ, তোমার তো আবার বাঙলা-জ্ঞান আমাদের মতো নয়। মুনিশ হল যারা চাষ বাসে সাহায্য করে। ফার্ম-লেবারার। তা, ওই খড় নিতে নিতে একটা বেশ বড় গর্ত তৈরি হল। সেই গর্তে এসে আশ্রয় নিল এক শেয়াল। কি রকম শেয়াল? না যে যাদু জানত। ম্যাজিসিয়ান। শেয়ালটা করত কি, না এক বৃদ্ধের রূপ ধরে সেই বাড়ির মালিককে দর্শন দিত। মালিকের নাম ধরো বিল্টুবাবু। একদিন ওই বৃদ্ধরূপী শেয়াল বিল্টুকে বললে, 'চলো, আজ আমার সঙ্গে একটা জায়গায় বেড়াতে চলো।' বিল্টু প্রথমে একটু ভয় পেয়ে বললে, 'না, আমি যাবো না।' কে না, কে এক বুড়ো? চিনি না, শুনি না। তা সেই বুড়োর চাপাচাপিতে বিল্টু শেষে রাজি হয়ে গেল। বৃদ্ধ বললে, বেশি দূরে তোমাকে যেতে হবে না, তুমি আমার এই গর্তে চলে এস। বিল্টু ভয়ে ভয়ে সেই খড়ের গর্তে গিয়ে ঢুকল। একটু এগিয়েই বিল্টু থ মেরে গেল।"

এলা বললে, 'থ মারাটা কি বাবা? তুমি আমার মতো বাঙলায় বলো।'

"থ মারা হল, থমকে যাওয়া। ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে না, টি. এইচ এ ডব্লু, থ, মানে জমে গেল। ফ্রিজড। বিল্টু দেখে কি,

সেই গর্তের ভেতর, বড় বড়, সুন্দর, সুন্দর ঘর। সাজানো গোছানো, টেরিফিক। সাজানো একটা ঘরে দু'জনে মুখোমুখি বসল। ভুরভুরে সুগন্ধী চা এল, খাবারদাবারও এসে গেল। বিল্টু মনে মনে ভাবছে, কি কাণ্ড, তারই উঠনে, তারই খড়ের গাদার ভেতর এ কি ম্যাজিক! সে এতদিন কিছুই জানত না। তবে জায়গাটা ভারি বিষণ্ণ। দিন কি রাত বোঝার উপায় নেই। আলোটা কেমন যেন! তা থাক গে, এখন তো খাওয়া যাক। অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া দাওয়া চলল, শেষে বিল্টু বললে, 'এবার তা হলে ওঠা যাক।' উঠে ফেরার জন্যে দু'পা গিয়ে যেই সে পেছন ফিরে তাকাল, দেখে কি, সব অদৃশ্য। কিছুই নেই, কেউ কোথাও নেই। বিল্টু হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সেই খড়ের গাদা থেকে।

"সেই বৃদ্ধের রোজকার রুটিন ছিল, সন্ধে হলেই বেরিয়ে যেত আর ফিরে আসত ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই। কোথায় যে যেত তাকে অনুসরণ করেও ধরা যেতনা; যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। তখন বিল্টু একদিন কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'রোজ আপনি যান কোথায়?' বৃদ্ধ বললে, 'আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে জোর খানা-পিনা হয়।' বিল্টু বললে, 'আমাকেও একদিন নিয়ে চলুন না। খুব ইচ্ছে করছে যেতে।' বৃদ্ধ প্রথমে রাজি হল না, শেষে বললে আচ্ছা চলো।' চলো বলেই সে বিল্টুর হাত চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুজনের যেন ডানা গজিয়ে গেল। এক কেটলি চায়ের জল গরম হতে যতটুকু সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে তারা এক বিশাল শহরে পৌঁছে গেল। লোকজন, গাড়ি ঘোড়া আলোর মালা! চারধার একেবারে ঝলমল করছে। তারা দু'জনে গিয়ে ঢুকলো বেশ বড় এক রেস্তোরাঁয়। এক গাদা লোক বসে গেছে টেবিলে, টেবিলে। খুব খানা-পিনা চলেছে। হই হট্টগোল। তারা দু'জনে গিয়ে বসল রেস্তোরাঁর দোতলায়। যেখানে বসল সেখান থেকে নিচের সব টেবিল দেখা যাচ্ছে। ভাল, ভাল সব খাবার প্লেটে প্লেটে। বৃদ্ধ বলা নেই কওয়া নেই নিচে নেমে

গেল। সেখানে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে, এর তার টেবিল থেকে ভাল ভাল খাবারের প্লেট নিয়ে ওপরে চলে এসে, বিল্টুকে বললে, 'এই নাও খাও।' বিল্টু তো অবাক। আচ্ছা যাদুকরের পাল্লায় তো পড়েছে! বিল্টু খাচ্ছে, আর তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। এমন সময় সুন্দর লাল পোশাক পরা রেস্তোরাঁর ওয়েটার বড় এক প্লেট চিকেন তন্দুর এক ভদ্রলোকের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। বিল্টুর নাকে এসে লাগল সেই সুগন্ধ। বিল্টু বৃদ্ধকে বললে, 'ওই প্লেটটা তুলে আনুন না। আমার জিভে জল এসে গেছে।'

বৃদ্ধ বললে, 'ওখানে আমি সুবিধে করতে পারব না ভাই। ওই লোকটি ভীষণ সৎ আর একরোখা। আমি ধরা পড়ে যাবো।'

"বিল্টুর মনে একটা আকাঙ্ক্ষা। আচ্ছা, তাহলে এই, সৎ আর একরোখা হলে, কেউ তার কিছু নিয়ে নিতে পারে না। বেশ, তাহলে আমিও ওইরকম হব। যাঁহাতক ভাবা, বিল্টু অমনি টাল খেয়ে পড়ে গেল একেবারে ওপর থেকে নিচে। যারা খানাপিনা করছিল একেবারে তাদের ঘাড়ের ওপর। তারা তো অবাক, এ লোকটা পড়ল কোথা থেকে? আকাশ থেকে না কি! বিল্টুও মহা অপ্রস্তুত। সে ওপর দিকে তাকাল। ওমা, একি? রেস্তেরাঁর দোতলাটা গেল কোথায়! নেই তো! মোটা একটা বিম চলে গেছে, এ-পাশ থেকে ও-পাশে। এতক্ষণ সে ওই বিমটার ওপর বসেছিল না কি?

"বিল্টু তখন যাদের ঘাড়ের ওপর পড়েছিল তাদের সব খুলে বলল। তারা বললে, 'সে কি রে ভাই, তুমি যে জায়গা থেকে এসেছ বলছ, সে জায়গা তো এখান থেকে হাজার মাইল দূরে।' বিল্টুর পকেট তো গড়ের মাঠ। তারা তখন চাঁদা তুলে ট্রেন-ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিলে।

"কি বুঝলে বলো?"

এলা বললে, 'সৎ, চরিত্রবান, আপরাইট না হলে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পড়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না।'

বিল্টুদা বললেন, 'আর একভাবে বলা যায়, সৎলোকের জায়গা

নিচের দিকে। তারা বাতাসে ভেসে থাকে না। তারা থাকে মাটিতে। পিন্টু, তুমি আমার এই অবস্থাটা চিরকালের ভেবো না। এটা তৈরি করে গেছেন এলার মা, তাঁর নিজের দেশের মান অনুসারে। এটা আমাদের দেশের মান অনুযায়ী হয়নি। এ আজ আছে কাল নেই। এদেশে ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে হলে শেয়ালকে সঙ্গী করতে হবে। যত রকমের চুরি, জচ্চুরি ভেল্কি দেখাতে হবে। আমাদের ক্লাস হল সেকেণ্ড ক্লাস।'

বিল্টুদা উঠে গেলেন। এলা বললে, 'জানো, আমার বাবা এক অদ্ভুত মানুষ। সিগারেট খায় না, মদ খায় না। মাছ, মাংস খায় না। নরম বিছানায় শোয় না। আমাদের বাগানের ওই মাথায় বিশাল এক ইদারা আছে। সেই ইদারায় কি শীত, কি গ্রীষ্ম, দু'বেলা হুড় হুড় করে চান করে। কখনও মিথ্যে কথা বলে না। কারোকে খাতির করে না। আমার ইচ্ছে করে, আমিও বাবার মতো হই।'

'আমারও সেই ইচ্ছে, আমার বাবার মতো হই।'

'হচ্ছ না কেন?'

'অনেক চেষ্টা করেও পারলুম না বলে আজ বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। ট্রেনে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা। এখন ভাবছি তোমার বাবার মতোই হবো। ভেবেছিলুম সন্ন্যাসী হয়ে যাবো। এখান থেকে যাবো, পরেশনাথ। পরেশনাথ পাহাড়ে শুনেছি অনেক সন্ন্যাসী থাকেন।'

'তুমি তো হিমালয়ে যেতে পারতে?'

'সে তো পারতুম; কিন্তু আমার যে মাত্র পঞ্চাশটা টাকা ছিল।'

'তুমি টাকা নেবে? আমার কাছে অনেক টাকা আছে।'

'আমি কারোর টাকায় সন্ন্যাসী হব না। নিজে নিজে হব।'

'তা তুমি সন্ন্যাসী হয়ে শোধ হয়ে দিও। কি আছে? কোনও প্রবলেম নেই।'

'ও মা সন্ন্যাসী হয়ে শোধ করব কি? তখন তো আমার কিছুই থাকবে না। শুধু একটা কৌপীন।'

'কৌপীন কি জিনিস ?'

'সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। একটু অসভ্য মতো একটা ব্যাপার। মেয়েদের সামনে পরতেও নেই, বলতেও নেই।'

'ও বুঝেছি, বুঝেছি। লয়েনস ক্লথ। তাহলে তখন তুমি মেয়েদের সামনে বেরোবে কি করে ?'

'বেরোবোই না। সন্ন্যাসীদের মেয়েদের মুখ দেখতেই নেই।'

'ও মা, সে কি ? আমার বাবার গুরু তো সন্ন্যাসী। তিনি তো আমাদের বাড়িতে আসেন।'

'সে তোমার গুরু হলে আসা যায়। সন্ন্যাসী থেকে গুরু হতে অনেক সময় লাগে।'

'আমার মত নেই।'

'মত নেই মানে ?'

'লেখাপড়া না করে সন্ন্যাসী হওয়াটা আমি সমর্থন করি না। কোনও কিছুর ভয়ে সন্ন্যাসী হওয়াটা ঠিক নয়। ভেরি ব্যাড। ওতে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।'

'আমি তো আর সন্ন্যাসী হব না ভাবছি। তোমার বাবার মতো হব।'

'যাঃ তা কেন, তুমি তোমার বাবার মতো হও। বলে না ? বাপকা বেটা। তোমার বাবা কি রকম ?'

'উরে ব্বাবা আগুনের গোলার মতো। ভীষণ পণ্ডিত। সব পরীক্ষায় ফার্স্ট।'

'আর তুমি ?'

'আমি লাস্টের আগে। মানে লিস্টটাকে উল্টে নিলে আমি সেকেণ্ড।'

'এলা হাসতে হাসতে আমার গায়ে লুটিয়ে পড়ল। হাসি চেপে বললে, 'লেখাপড়া করো না বুঝি ?'

'কেন করবো না ? সারা দিনরাত পড়ি।'

'তাও হচ্ছে না ?'

'না।'

'কেন বলো তো?'

'সেইটাই তো কেউ বুঝতে পারছে না। মাথায় কিছু নেই, না কি, কে জানে? তাই তাড়িয়ে দেবার আগে নিজেই নিজেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'আর ফিরবে না?'

'কভি নেহি!'

'তোমার মা, বাবা কাঁদবেন।'

'বাবা কাঁদবেন না। আর মাকে বাবা কাঁদতে দেবেন না। ধমকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।'

'কিন্তু আমার বাবা হতে গেলে যে তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে? অনেক লেখাপড়া করতে হবে। সারা পৃথিবী ঘুরতে হবে। ঘোড়ায় চাপা শিখতে হবে। শিখতে হবে বন্দুক ছোঁড়া। সাত আটটা ভাষা শিখতে হবে। শিখতে হবে কুংফু, জুজুৎসু, মটোর চালানো, প্লেন চালানো।'

'অঙ্ক?'

'অফকোর্স।'

'অঙ্ক ছাড়া কি পৃথিবীতে কিছু হয় না?'

'কি করে হবে? পৃথিবীটাই তো অঙ্কের পৃথিবী। হিসেবের পৃথিবী।'

'এলা উঠে গিয়ে পিয়ানো বাজাতে বসল। পিয়ানো বাজানো আমি সিনেমায় দেখেছি। এই প্রথম আমি সামনা-সামনি দেখলুম। বাজনাটার পিড়িং পিড়িং আমি তেমন বুঝি না; তবে যন্ত্রটা দেখতে বেশ বড়লোকের মতো। মহাবিপদে পড়ে গেলুম। আমি যে এখন চান করবো। এলা বাজাচ্ছে। বলতে গেলে যদি বিরক্ত হয়। এমন সময় বিল্টুদা এলেন। হাতে প্যাণ্ট, জামা, গেঞ্জি, ডোরাকাটা পাজামা। কোথা থেকে নিয়ে এলেন কে জানে। আমি বললুম 'বিল্টুদা, আমি যে এইবার চান করব।'

'করবেই তো। সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে। আমিও করব। তুমি কোথায় করবে? বাথরুমে না ওপন এয়ার?'

'ওপন এয়ার।'

'ঠাণ্ডা লাগবে না? সর্দি-জ্বর হবে না?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে চলো।'

এইবার আমরা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরলুম। পেছন দিকটা আরও সুন্দর। একেবারে ফাঁকা। অনেক দূরে কয়লাখনির গর্তে নামার সেই লিফটগুলো দেখা যাচ্ছে। দেহাতি গ্রামের ছোট ছোট চালা। হিন্দিতে মা তার ছেলেকে ডাকছে? বিশাল এক পাখির মতো রাত্রি নামছে ডানা মুড়ে। টিপ টিপ আলো জ্বলে উঠছে। লাটাখাম্বায় বাঁধা লোহার বালতি নামছে ইদারায়। তার শব্দ। যেমন ভাল লাগছে। খারাপও লাগছে তেমনি। বাড়ির কথা ভেবে। এতক্ষণে সেখানে হইহই পড়ে গেছে। থানা পুলিস হচ্ছে। হাসপাতালে, হাসপাতালে খবর নেওয়া আরম্ভ হয়েছে। মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গেলুম। এরপর যদি আমি ফিরি, আমার বাবা বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। সত্যি সত্যিই বের করে দেবেন। জ্যাঠামশাইও বাঁচাতে পারবেন না। বাবা ভীষণ কড়া মানুষ। আমার সামনে এখন দুটো রাস্তা। হয় মরে যাওয়া, নয় তো একেবারে চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়া।

একসঙ্গে অনেক কুকুর ডাকছে। বিল্টুদা বললেন, 'আর একটু পরেই ফেরোসাস কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন আর এখান থেকে কেউ বেরোতেও পারবে না, ঢুকতেও পারবে না, আমার সাহায্য ছাড়া।'

'এই ব্যবস্থা কেন করেছেন বিল্টুদা?'

'প্রাণে বাঁচার জন্যে ভাই। এই জায়গাটার নাম ধানবাদ। এখানে যদি তুমি কোনও মানুষকে মারো, তাহলে মরার সময় তাকে বলতে হবে ধন্যবাদ। আর যে মারবে সে বলবে সরি। ভারতবর্ষের টেকসাস।'

'কি কি কুকুর ছাড়বেন?'

'ডোবারম্যান, অ্যালসেসিয়ান, বুলডগ, সেন্ট বারনারড। যে যার এলাকায় ঘুরবে, পাহারা দেবে। রাত হোক না, দেখবে মজা।'

ইদারার ঠাণ্ডা জলে এমনিই শীত করছিল। কুকুরের ভয়ে শীত আরও বেড়ে গেল। আসার পথে দেখলুম আস্তাবলে দুটো তাগড়া ঘোড়া রয়েছে। আসতে আসতে কেন জানিনা বিল্টুদা হঠাৎ বললেন, 'মন থেকে ভয় তাড়াও পিণ্টু। ভীতুদের জীবনে কিছু হয় না! জীবনকে পিঠ দেখিও না, মুখ দেখাও।'

এলা পড়তে বসেছে। আমি দাড়িয়ে আছি জানালার ধারে। হঠাৎ একটা হুইস্‌ল বাজল, আর কোথা থেকে ছুটে এল একপাল কুকুর। কয়েকটা কুকুর ঠিক বাছুরের মতো বড়। একটু আগে ভেবেছিলুম, আমি বিল্টুদা হব। এখন মনে হচ্ছে দরকার নেই। একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। হঠাৎ বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে মনটা ভীষণ কেঁদে উঠল। আমার বাবা, আমার মা, আমার জ্যাঠামশাই, আমার সেই বেড়ালটা, আমাদের ছাদ। আমার ডানা থাকলে এখনি উড়ে চলে যেতুম; কিংবা বিল্টুদার গল্পের ওই শেয়াল বুড়োটা যদি আসত। কুকুরদের সঙ্গে আরও তিন চারজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিল্টুদা। সবাই মিলে কুকুরগুলোকে নানারকম উপদেশ দিচ্ছেন। কি কাণ্ড বাবা!

ছবির মতো একটা ঘরে আমাকে শোয়ানো হল। আমি একা একটা ঘরে। বিরাট এক বিছানা। চারপাশে বড় বড় জানলা। এলা, বিল্টুদা, দু'জনেই আমাকে গুডনাইট করে গেছেন। সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। ভাবছি, বিল্টুদা কেন আমাকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে চাপ দিচ্ছেন না। বিল্টুদা কি ছেলেধরা? ডাকাত? না কি? শেয়াল বুড়োর গল্পটার মধ্যে কোনও রহস্য নেই তো! এলা তো মেমসাহেব তাই মনে হয় একটু অহঙ্কারী। একটা গুম গুম শব্দ হচ্ছে কোথায়! এই সেই। ধানবাদের মাটির তলায়

আগুন জ্বলছে। অনেক দূরে পরপর কয়েকটা বোমার শব্দ হল। কে জানে কি? ডিনামাইট দিয়ে কয়লা ফাটাচ্ছে না কি।

কিছুতেই আর ঘুম আসে না। বাড়ির চিন্তা। হঠাৎ মনে হল, অপঘাতে মানুষ মারা গেলে ভূত হয়। হঠাৎ যদি এলার মায়ের ভূত এই বাড়িতে আসেন। এত প্রিয় বাড়ি তাঁর। যদি এই ঘরে এসে জানালার ধারের ওই চেয়ারটায় বসেন। 'ভয় তাড়াও পিন্টু'—এ কথা কেন বললেন বিল্টুদা! এ বাড়িতে তাহলে নিশ্চয় ভয়ের কিছু আছে। বিছানা থেকে উঠে ঘরের বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়ালুম। ভাবছি, খুলে বাইরে গিয়ে দেখবো কে কোথায় আছে। গিয়ে বলবো, আমি তো কোনও দিন একা শুইনি, আমার ভীষণ ভয় করছে বিল্টুদা। ভয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে বলে ফেলাই ভাল। রাত ভোর হতে এখনও অনেক বাকি। দরজাটায় যেই হাত রেখেছি, বাইরে একটা গড়ড়্ করে চাপা গর্জন হল। বাঃ, বেশ মজা, বিল্টুদা এখানে কুকুর ছেড়ে রেখেছেন। আমাকে একবারও বলেন নি। আমার হঠাৎ বেরোবার প্রয়োজন হলে আমি কি করবো! সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। সেই গুম গুম শব্দটা এখনও হচ্ছে। সারা রাতই হবে মনে হয়।

আমি জানালার ধারে সরে এলুম। চারপাশ ধু ধু ফাঁকা। চাঁদটা বেশ বড় হয়েছে। নিচের জমিতে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় কুকুরগুলো ঘুরছে। হঠাৎ দেখি এক অশ্বারোহী। খুব ধীরে, ঘোড়া চালিয়ে ওপাশ থেকে এপাশে আসছে। চিনতে অসুবিধে হল না! বিল্টুদা। এ কি ঘুমোন নি! আমি তাড়াতাড়ি জানালার নিচে বসে পড়লুম: যদি আমাকে দেখে ফেলল, ভাববেন আমি বিল্টুদাকে দেখছি। এত রাতে কেউ ঘোড়ায় চাপে? কি জানি বাবা! এ আমি কোথায় এলুম! ঘোড়াটা এদিক থেকে চলে গেল ওদিকে। আমি বিছানায় ফিরে এসে চাদরে মুখ গুজে শুয়ে পড়লুম। মনে মনে প্রার্থনা করলুম, ঈশ্বর তাড়াতাড়ি রাত ভোর করে দাও। আমি আর থাকতে চাই না, আমার বাড়ি ছেড়ে। সন্ন্যাসী হবার মতো সাহস আমার নেই ভগবান। ভগবানের কথা, মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে

আমি বোধহয় এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ঝাঁ করে ভেঙে গেল। আমার সামনে একটা বন্ধ দরজা। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল ঘুটঘুটে অন্ধকার একটা হলঘর। আমি হাতড়াতে হাতড়াতে সামনে এগোচ্ছি! হঠাৎ আমার মাথায় কি একটা এসে লাগল। জিনিসটা দুলে উঠল। দুলতে, দুলতে দু'তিনবার আমার মাথা ছুঁয়ে গেল। আমি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ধরলুম। দুটো পা। ওপর দিকে তাকালুম। একটা দেহ। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে। একজন মানুষ। আমি ভয়ে চিৎকার করে পড়ে গেলুম। স্বপ্নে পড়ে গেলে ঘুম ভাঙবেই। চিৎকারটা মনে হয় বেশ জোরোই করেছি। আমার ঘরের দরজা খুলে বিল্টুদা ঢুকলেন। দরজাটা কাল রাতে বাইরে থেকেই বন্ধ ছিল। এখন বুঝলুম। টানলেও খুলত না। তার মানে ডোবারম্যান আমার কিছু করতে পারত না! বিল্টুদার পরনে ঘোড়ায় চড়ার সাদা পোশাক। হাতে একটা হাণ্টার। দেবদূতের মতো দেখাচ্ছে। দু'হাতে হাণ্টারটা ধরে আছেন। মুখে সেই অপূর্ব হাসি, 'কি হল পিণ্টু ? স্বপ্ন ?'

'হ্যাঁ বিল্টুদা। আমি এখুনি বাড়ি যাবো।'

'গুড। গুড বয়। আমি জানতুম। উঠে পড়ো। এক ঘণ্টার মধ্যে একটা ট্রেন আছে।'

সবে ভোর হচ্ছে। পুবের আকাশ আগুনের মতো লাল। কত পাখি যে ডাকছে একসঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তৈরি হয়ে গেলুম। এলা বললে, 'সে কি তুমি চলে যাবে? আমি ভেবেছিলুম, তুমি বেশ থাকবে? আমরা দু'জনে মিলে লেখা-পড়া করব। গান শিখবো। পিয়ানো বাজাবো। বেড়াতে যাবো। রিভলভার ছোঁড়া শিখবো। ঘোড়ায় চড়া শিখবো; আর তুমি কি না চলে যাচ্ছ?

এলার চোখ ছলছল করছে। এলাকে আমি অহঙ্কারী, অমিশুক ভেবেছিলুম। তা তো নয়!

বিল্টুদা বললেন, 'ও তো একা থাকে, ভেবেছিল তোমাকে সঙ্গী

পাবে ? তুমি ছেলেটা কিন্তু খুব ভাল, অনেকটা স্বপ্নের মতো। তুমি এখানে থাকলে তোমাকে আমি তৈরি করে দিতুম। আমার মনে হয়, তুমি খুব বড় একজন আর্টিস্ট হবে।'

'আমি আবার ফিরে আসতে পারি ?'

'অফ কোর্স। মা, বাবা, গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে আসবে। এই বাড়িতে আমার পরে আর কেউ নেই।' এলা আমাকে একটা সুন্দর কলম উপহার দিল। আমি কি দোবো ? আমার তো কিছু নেই দেবার মতো। নিচের মাঠে একটা কুকুরের ট্রেনিং হচ্ছে। আগুনের রিং, কুকুরটাকে তার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখার মতো দৃশ্য। আগুনের রিংটা দুজনে দু পাশ থেকে ধরে আছে। আর একজন কুকুরটাকে বোঝাচ্ছে, যদি ওর ভিতর দিয়ে এপাশে আসতে পারো, তাহলে এই বড় মাংসের টুকরোটা পাবে।

বিল্টুদা বললেন, 'কুকুরটাকে তিনদিন না খাইয়ে রাখা হয়েছে। ওই মাংসের টুকরোটার জন্যে ও এখন জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে।'

'ওর মুখ চোখ দেখে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। কি করুণ !'

'দুঃখ এলে কোনও কিছু শেখানো যায় না। শিক্ষককে কঠোর হতে হবেই, ছাত্রের কল্যাণের জন্যে। দয়ামায়া করলেই ভবিষ্যৎ গেল। কুকুরটা যখন সব শিখে যাবে তখন এর কি খাতির হবে জানো! কত টাকা রোজগার করবে জানো ? সাধারণ একজন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। এ কি হবে জানো তো, গুরু মারা চেলা !'

স্টেশানে এসে, ট্রেনের কামরায় বসে বিল্টুদা আমার ঠিকানাটা লিখে নিলেন, আর তাঁর একটা কার্ড আমাকে দিলেন। কার্ডটা হাতে নিয়ে চমকে গেলুম। আসল নাম বিরাজ বসু, এক্স. আই. পি. এস.। আই. পি. এস. রাই তো পুলিসের বড় অফিসার হন। আবার এম. এস. সি (ক্যান্টাব)। মানে বিদেশে লেখাপড়া

শিখেছেন। নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হচ্ছে। বট গাছের পাশে, চারাগাছ।

ট্রেন ছাড়ার সময় হল। বিল্টুদা বললেন, 'ওই কুকুরটা আর গল্পের শেয়ালটাকে সারা জীবন মনে রেখো। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। জীবন থেকে পালাবে না, জীবনের ভেতর ঢুকে যাবে সাহস করে। জীবন হল জ্বলন্ত একটা রিং তার ভেতর দিয়ে অক্লেশে চলে যাওয়াটাই হল শিক্ষা। আর এইটা যিনি শেখাতে পারেন তিনিই শিক্ষক। আবার এসো। এলাকে নিয়ে একদিন তোমাদের বাড়িতে আমি যাবো।'

ট্রেনটা যখন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে তখন বিল্টুদা শেষ কথা বললেন, 'কারোর মতো হবার চেষ্টা করবে না, নিজের মতো হবে।' সন্ধ্যের ঝোঁকে বাড়ির কাছাকাছি এসে নিজের থেকেই পা দুটো যেন অচল হয়ে গেল। একটা বাঁক ঘুরলেই বাড়ি। তৃষার তেলেভাজার দোকানের সামনে দাঁড়াতেই সে ছুটে এল।

'কোথায় ছিলে তুমি? ছি ছি।'

'কেন তৃষা?'

'সে আমি বলতে পারবো না। তুমি আগে বাড়ি যাও।'

আমি টলতে টলতে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলুম। আমার পা আর চলছে না। কি হয়েছে, কি হতে পারে! আমি শামুকাকার রকে বসে পড়লুম। বসেই মনে হল, বিল্টুদা বলেছেন, 'জীবনকে পিঠ দেখাবে না, মুখ দেখাবে।' আবার উঠে পড়লুম। বাড়ির বাইরেটা থমথম করছে। দরজাটা হাটখোলা। উঠনের রকে মা বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে আছেন পাড়ার মহিলারা।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে, কে একজন বললেন, 'দিদি ওই যে এসেছে।'

আমি মা বলে যেই দু'পা এগিয়েছি, মা অমনি চিৎকার করে উঠলেন, 'তাড়া, তাড়া, শয়তানটাকে মেরে তাড়া।' মায়ের হাতের কাছে স্টেনলেস স্টিলের একটা গেলাস ছিল সেইটা সজোরে ছুঁড়ে

মারলেন। আমার কপালের একপাশে সজোরে লেগে গেলাসটা পড়ে গেল পায়ের কাছে। ভীষণ লেগেছে। আমি সেইখানেই বসে পড়লুম। মা কেঁদে উঠলেন। একজন এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তুমি শিগগির শ্মশানে যাও। তোমাকে খুঁজতে গিয়ে তোমার জ্যাঠামশাই গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছেন কাল রাতে মেডিকেল কলেজের সামনে'

তীরবেগে দৌড়তে লাগলুম শ্মশানের দিকে। কোথা থেকে ভীষণ বল এসে গেছে শরীরে। আমার কপালের পাশ দিয়ে কি একটা গড়াচ্ছে। হোঁচট খেয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা উড়ে গেল। হোক, যত কিছু আছে সব আমার হোক। আমিও কেন গাড়ি চাপা পড়ি না; তাহলে আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এক্ষণি চলে যেতে পারি।

শ্মশানে জ্যাঠামশাইকে তখন চিতায় তোলা হবে। ফুলের বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন। মুখটা যেন ফুটে আছে পদ্মের মতো। জানি কিসের আনন্দ; আমাদের ফেলে জ্যাঠাইমার কাছে যাবার আনন্দ।

বাবা আমাকে কিচ্ছু বলেন না, একটাও কথা নয়। শুধু আর একজনকে বললেন মুখাগ্নিটা ওই করুক। আমাদের সেই ছাত। সেই ছাদের ঘর। সবই আছে, তিনি নেই। কে ভেঙে ভেঙে আমার মুখে একটু একটু করে কচুরি আর জিলিপি ঢুকিয়ে দেবেন। কে আমার মাথা বুকে চেপে ধরে বলবেন, 'কিচ্ছু ভেবো না, তুমি অনেক অনেক বড় হবে।' এই সিঁড়িতে একজোড়া চটির শব্দ আর উঠবে না। এক ঝাঁক কাক, কা কা করে শুধুই খুঁজে যাবে একজন প্রিয় মানুষকে। রথের মেলা থেকে যে-গোলাপের চারাটা এনে জ্যাঠামশাই পুঁতেছিলেন, সেই গাছটায় একটিমাত্র সাদা গোলাপ ফুটেছে। ওইটাই আমার জ্যাঠামশাইয়ের মুখ। আমি ওই কুকুরটাকে মনে রেখেছি—জীবন এক আগুনের রিং, তার ভেতর দিয়ে গলে যেতে হবে অক্লেশে।

প্রায় তিন মাস হয়ে গেল আমার জ্যাঠামশাই মারা গেছেন। সেদিন অক্ষয়বাবু এসে জ্যাঠামশাইয়ের একটা ছবি বেশ বড় করে, সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছেন। ছবিটা জ্যাঠাইমার ছবির পাশে ঝোলান হয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের মুখে সেই সুন্দর হাসি, যে হাসি হেসে তিনি আমাকে বলতেন, পিণ্টুবাবু আজ অমন মুখভার কেন? কেউ কিছু বলেছে! কিসের দুঃখ তোমার! গরম রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি। হয়েছে যখন এখুনি ব্যবস্থা হচ্ছে। গোটা কুড়ি টপাটপ গালে ফেলে দাও। মনে ফুর্তি দেহে বল।' জ্যাঠামশাই অমনি, মণি, বলে হাঁক ডাক শুরু করতেন। সব কাজ ফেলে ছুটে আসত মণি। মণি খুব মজার ছেলে। সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে করতে বড হয়েছে। এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই। নেই বলেই যেন তার আনন্দ। কথায় কথায় বলে, 'কেউ নেই বলেই, আমার সবাই আছে।' মণি ডাক শুনে ছুটে এসে বলত, 'ফরমাইয়ে, বড়বাবু।'

জ্যাঠামশাই অমনি বলতেন, 'রসগুমলা লে-আও, গরমাগরম। কড়াসে উতারকে।'

'কিতনা?'

'চালিশঠো।'

'যো হুকুম।'

মণি অমনি ছুটলো মোড়ের দোকানে। বিশাল দোকান। গোলগাল পরেশদা সেই দোকানে বসে আছেন, ছানার মতো গায়ের রঙ। জ্যাঠামশাই বলতেন, 'পরেশ ঈশ্বরের অংশ। অমৃত বিতরণের পুণ্য কাজ নিয়ে সে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে। এইটাই ওর শেষ জন্ম। ছানার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছে।' নির্জন এই দুপুরে, জ্যাঠামশাইয়ের ছবির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয়, আমিই কারণ। আমার জন্যেই মারা গেলেন আমার দেবতার মতো জ্যাঠামশাই। বাবার বকুনি খেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে না গেলে, আমায় জ্যাঠামশাই অমন করে খুঁজতে বেরোতেন না হাসপাতালে, হাসপাতালে। ভেবে-

ছিলেন আমি হয়তো গাড়ি চাপাই পড়েছি। কল্পনার চোখে দেখতে পাই, অন্ধকার রাত। সারা শহরে পুটপুট আলো, ধূলো ধোঁয়া। রাস্তায় এলোমেলো গাড়ি। গাড়ির পর গাড়ি। জ্যাঠামশাই মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে যেই রাস্তা পার হতে গেলেন একটা সাদা গাড়ি হুস্ করে এসে দেহটাকে পিষে দিয়ে চলে গেল। আমিই দায়ী। আমি, আমি, আমি। আমি একটা মহাশয়তান, গাধা। অলস, অকর্মণ্য। গবেট। আমার বাবা ঠিকই বলেছেন, একমাত্র ছেলে। ছেলেটাকে খরচের খাতায় লিখে রাখো। খাইয়ে দাইয়ে মোষের মতো একটা শরীর তৈরি করে দাও। ওই ঠেলা ঠেলে, মোট বয়ে দিন চালাবে। ওই হয়, ভদ্র, শিক্ষিতের ঘরেই ছাগল জন্মায়। যাদের কোনও অভাব নেই তাদের ঘরের ছেলেরাই হয় অমানুষ। ফুটপাথের ছেলেরা মানুষ হতে পারে, বড় হতে পারে সুযোগ পেলে। আদুরে ছেলেরা স্বার্থপর বাঁদরই হয়। না চাইতেই সব পেয়ে যায় তো। ছেলেদের বেশ দুঃখকষ্টে রাখতে হয়, তবেই মানুষ হয়। জীবনটাকে বুঝতে শেখে। জীবনটাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে শেখে। স্বার্থপর জানোয়ার হয়ে যায় না। আমিই দায়ী। আমিই সব কারণের মূল কারণ। আমার জ্যাঠামশাই আরও কত বড় হতে পারতেন। বৃদ্ধ। এক মাথা চুল ঘাড়ের কাছে লুটোপুটি করত। সাদা তুষারের মতো। আরাম চেয়ারে আলোয়ান গায়ে বসে থাকতেন। আমি তখন অনেক বড়। জ্যাঠামশাই যেমন চেয়েছিলেন, আমি সবরকমই হতুম। তিনবার বিলেত ফেরত। বিশাল বড় ডাক্তার। জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের কাছে ছোট ছেলেটির মতো বসে লণ্ডনের গল্প বলতুম। সব শেষ করে দিয়েছি আমি। সব স্বপ্ন চুরমার। আমি ঠিক করে ফেলেছি, নিজেকে মেরেই ফেলব। মরলে আমি আমার সবচেয়ে প্রাণের মানুষের দেখা পাবো। ভগবান যখন স্বর্গের দরজা খুলে দেবেন তখন দেখবো স্বর্গের বাগানে, গাছের তলায় আমার জ্যাঠামশাই বসে আছেন। ওই ছবির হাসি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। স্বর্গে গেলে শুনেছি মানুষের গায়ের রঙ সোনার মতো হয়ে

যায়। চুলগুলো হয়ে যায় রুপোর মতো। চোখ দুটো জলজ্বল করে রুবির মতো।

দুপুরবেলা সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বাবা অফিসে। মা একটু শুয়েছেন। জ্যাঠামশাইয়ের ছবিটা প্রতিদিন এই সময়ে যেন কথা বলে। জ্যাঠামশাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে চান—পিন্টু, মানুষের নিয়তি বলে একটা জিনিস আছে। তার হাত থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। কেউ কারোর ভাল-মন্দের জন্য দায়ী নয়। যা হবার তা হবেই। তোমার মনে নেই, তোমার জ্যাঠাইয়ের মৃত্যুর কথা। তুমি তখন ছোট। আমরা সবাই কালীঘাটের মন্দিরে গিয়েছিলুম পুজো দিতে। প্রণাম সেরে তোমার জ্যাঠাইমা নেমে আসবেন হঠাৎ কোথা থেকে একটা পাগলি এসে এমন এক ধাক্কা মারল, ছিটকে পড়ে গেলেন তোমার জ্যাঠাইমা। এক মিনিটে সব শেষ। এই মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী পিন্টু! কেউ নয়। এই হল নিয়তি। দিন ফুরোয়। আমরা জানতে পারি না। আমাদের জানার ক্ষমতা নেই। কেউ আগে যায়, কেউ পরে যায়। কোনও ব্যাপারেই আমাদের কোনও হাত নেই। আমরা এসেছি আমাদের চলতে হবে। আমাদের ওপর দিয়ে কাল চলে যাবে স্রোতের মতো। মনে হবে, আমরাই চলছি। প্রতিদিনে ভেসে আসবে ঘটনার পর ঘটনা। কখনও হাসব, কখনও কাঁদব। সাফল্যের আনন্দে দু'হাত তুলে নাচব। ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ব। একদিন মুছে যাবে আমার অস্তিত্ব। কাল কিন্তু থামবে না। মহাকাল থামতে জানে না। পিন্টু সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখ। নদীর স্রোতে খুঁটির মতো। দুর্বল হয়ে পড়বে না। কাপুরুষ হবে না। কাপুরুষ মরার আগেই বহুবার মরে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হল। চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশু। বিশু নেহরু পুরস্কার পেয়ে রাশিয়া গিয়েছিল। আমার খুব হিংসে হয়েছিল। বিশু আমার সহপাঠী। বিশু যা পারে আমি তা পারি না কেন! এই বিশুর জন্যেই আমার

যত হেনস্তা। উঠতে বসতে আমাকে শুনতে হয়—বিশুকে দেখে শেখ্। সোনার চাঁদ, হীরের টুকরো। সেই বিশু। বিশু কি আমাকে বড় বড় গল্প শোনাতে এসেছে!

বিশু এগিয়ে এসে আমার পিঠে হাত রাখল। আমার পিঠটা যেন জ্বলে গেল। তুমি ভাল ছেলে, তুমি ফার্স্ট বয়, তুমি তোমার মতো থাক। আমি অপদার্থ, গবেট। আমি আমার মতো থাকি। পিঠ থেকে এক ঝটকায় বিশুর হাতটা সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল।

বিশু দেখি কাঁদছে। বিশুর দু'চোখে জল।

'কাঁদছিস কেন বিশু?'

দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বিশু বললে, 'জ্যাঠামশাইয়ের কথা মনে পড়ছে ভাই। ফিরে এসে তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। আমাকে বলেছিলেন, তোমার মুখে কত গল্প শুনবো। চাঁদের আলোয় ছাতে মাদুর পেতে। গরম গরম ডাল-ফুলুরি খাবো আর গল্প করব। সেই জ্যাঠামশাই আজ কোথায়!'

বিশু ঝরঝর করে কাঁদছে। জ্যাঠামশাই ছিলেন আমার জগৎ। সকালে উঠে জ্যাঠামশাইয়ের মুখ দেখে মনে করতুম ভোরের সূর্য দেখছি। সেই জ্যাঠামশাইকে বিশুও এত ভালবাসে! বিশুকে আমিও ভালবেসে ফেললুম। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে দু'জনে খুবখানিক কেঁদে নিলুম। যত কাঁদি ততই যেন কান্না পায়। একসময় আমাদের কান্না থামল। অঝোরে বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশটা যেমন ঝকঝকে হয়ে যায়, আমাদের মনও সেইরকম পরিষ্কার হয়ে গেল।

বিশু ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে বললে, 'পিণ্টু, তুই আমাকে তোর শত্রু ভাবিসনি। বিশ্বাস কর আমি তোকে ভীষণ ভালবাসি। প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হই, বল সেটা কি আমার দোষ। আমি হয়ে যাই। যা পড়ি কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না। যে কোনও অঙ্ক আমার কাছে জলের মতো সহজ। উত্তরটা আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কেন যে এমন হয় কিছুতেই আমি বুঝতে পারি

না। পিণ্টু, আমার কি মনে হয় জানিস, আমার তো কেউ কোথাও নেই। মামার বাড়িতে পড়ে আছি, তাই ভগবান আমাকে সাহায্য করেন। ছেলেটা যাতে হেরে না যায়। আমি রোজ ভগবানকে ডাকি। বলি, ভগবান, তুমি আমাকে একটু দেখো। আমার বাবা আর মাকে তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমি যদি নষ্ট হয়ে যাই, আমার বাবা আর মায়ের বদনাম হয়ে যাবে। সবাই বলবে, ছেলেটা মানুষ হল না। আমার ভীষণ ইচ্ছে, ডাক্তার হব। বাবা আর মায়ের নামে একটা হাসপাতাল করব। বিনা পয়সায় সকলের চিকিৎসা করব। আমরা গরিব বলে, আমার মা-বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। জানিস তো, আমার অসুখ করলে ওষুধ খাই না। কালীবাড়িতে গিয়ে একটু চরণামৃত খেয়ে আসি। মা কালীকে বলি, বাঁচালে বাঁচবো। মারলে মরবো। আর দেখি ঠিক সেরে উঠেছি। কতবার মনে হয়, মরে যাবো, বেঁচে থেকে কি লাভ! পরক্ষণেই মনে হয়, কেন মরবো, আমার মা আর বাবার নাম কে করবে! আমার মধ্যেই তো তাঁরা বেঁচে থাকবেন।'

বিশুর কথায় আমার মনে বেশ বল এসে গেল। 'বিশু, কি করলে আমি তোর মতো হব?'

'আমি তো সেইজন্যেই এসেছি ভাই। তোকে আমি সাহায্য করব। তোকে আমার সত্যদার কাছে নিয়ে যাব। দেখবি কি সুন্দর পড়ান তিনি। সবাই কি আর পড়াতে পারেন। সত্যদার কাছে গেলে, মনে হবে দিন-রাত পড়ি। মানুষের জীবন তো তেমন বড় নয়, অথচ পড়ার শেষ নেই। পিণ্টু তোকে আমি তৈরী করেই ছাড়বো। যতদিন বাঁচবো দু'জনে বন্ধু থাকবো। কেউ কারোকে ভুলবো না। আয় জ্যাঠামশাইয়ের ছবির সামনে আজ আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি।'

বিশু চলে গেল। এ বাড়ির কেউই আর আমাকে তেমন দেখতে পারে না। আজকাল আমাকে আবার অপয়া বলতে আরম্ভ করেছে। আমি জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই না কি বাড়িতে মৃত্যু ঢুকেছে। বাবা

আমাকে আর পড়ান না। মা বললেই বলেন, পণ্ডশ্রম করতে রাজি নই। আমার সময়ের দাম আছে।' জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু বাবাকে বেশ ধাক্কা মেরে গেছে। দু'জনের খুব মিল ছিল তো। কেউ কারোকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। খাওয়া-দাওয়া, গান, গল্প। বাড়িতে বড় বড় গানের আসর বসত। জ্যাঠামশাই ছিলেন সমঝদার শ্রোতা। একটা নরম তুলতুলে কাশ্মিরী শাল ছিল আমার জ্যাঠামশাইয়ের। শীতকালে সেই শালটা গায়ে দিয়ে জ্যাঠামশাই গানের আসরে জমিয়ে বসতেন। পাশে টেনে নিতেন। কিছুক্ষণ পরেই আমি ঢুকে যেতুম সেই শালের তলায়। গায়ে গা লাগিয়ে আরাম করে গান শুনতুম। জ্যাঠামশাই ফিসফিস করে বলতেন, 'বাপি, শুনছো! তোমাকেও গান শিখতে হবে। একদিন তোমাকেও ওইরকম গাইতে হবে আসরে বসে। তোমার বাবা, কি সুন্দর বেহালা বাজায় দেখছ তো! আমাদের রক্তে সংগীত আছে। একটু সাধনা করলেই হবে। একজন মানুষের সবকিছু শেখা উচিত, তা না হলে জীবনটা বড় একপেশে হয়ে যায়। খোলতাই হয় না তেমন।'

বিশু আমাকে বলেছিল, যখন খুব মন খারাপ হবে, তখন খুব লম্বা একটা হাঁটা দিবি। মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটে যাবি মাইলের পর মাইল। মনে মনে একটু গান গাইতে পারিস গুনগুন করে। রবীন্দ্রনাথের গান। বড় গাছ দেখলে তার দিকে তাকাবি। গোড়া থেকে একেবারে মাথা পর্যন্ত, যেখানে আকাশ নেমে এসেছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে নীল হয়ে। ভাববার চেষ্টা করবি, কত বছর ধরে, কত ঝড়-ঝাপটা সামলে গাছটা একটু একটু করে তবেই না অত বড় হয়েছে! আগের কত মানুষকে দেখেছে। আজকের কতজনকে দেখছে! আগামী দিনের কত মানুষকে দেখবে। একটা গাছ, বহুকালের কোনও পুরনো বাড়ি, গঙ্গার ধারের প্রাচীন ঘাট, দেবালয়, আমাদের বেঁচে থাকা শেখায়। অতীত নিয়ে, বর্তমান নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে। মানুষের আসা-যাওয়ার সাক্ষী হয়ে। পথও তাই। যেন সময়ের ফিতে। বিশু বলেছিল, পথে নামলে দেখবি, না চলে থাকা

যায় না। চলছি তো চলছিই। পা রাখা মাত্রই টেনে নেয়। থেমে পড়লে কেমন যেন বেমানান লাগে। চলতে চলতে, অন্য মানুষ বলে, কি হল, থামলে কেন? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? পথের ব্যাকরণ হল চলা। পথ হারে না, পথ হারিয়ে দেয়। পথ হারিয়ে যায়। পথ চলে যায় এক লক্ষ্য থেকে আর এক লক্ষ্যে। বিশু কি সুন্দর বলে! আমি পারি না! আমার মাথায় কোনও ভাবনা আসে না। একেবারে নিরেট ক্রিকেট বলের মতো। রাগ আর অভিমান ছাড়া আমার মাথায় কিছু নেই। আর দু'চোখ ভরা জল।

আমাদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে লম্বা একটা পথ এঁকেবেঁকে বহুদূর চলে গেছে। শুনেছি অনেক দূরে পথের শেষে একটা বাগান আছে। সেই বাড়িতে থাকতেন রাণী ভবানী। সেখানে সোনার জগদ্ধাত্রী মূর্তি আছে। বাড়িটা না কি ভূতের বাড়ি।

আজকাল বাড়ি থেকে বেরোবার সময় কেউ আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না। কোথায় যাচ্ছিস? কখন ফিরবি? আমি না কি খুনী। আমার জ্যাঠামশাইকে আমি বলতে গেলে খুনই করেছি। আমি শয়তান মানুষ হয়ে জন্মেছি। বেশ বলে সব। যা মুখে আসে তাই। আমি আবার কোথাও চলে যেতুম। শুধু জ্যাঠামশাই আমাকে বেঁধে রেখে গেছেন। আমাকে প্রমাণ করতে হবে—আমি শয়তান নই ভগবান। আমি অপয়া নই পয়া।

যে রবীন্দ্রসংগীতটা আমার ভীষণ ভাল লাগে, সেটা হল, বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে, এখন ফেরাবে তারে কিসের ছলে। গানটা গাইছি আর হনহন করে হাঁটছি। বিকেলের তবক মোড়া আলোয় চারপাশ ভারি সুন্দর। বিশাল সবুজ মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। একটা বাড়ির সামনের বাগানে ফুলের মতো একদল শিশু পাখির মতো কিচিরমিচির করছে। সামনেই একটা বড় চটকল। ছুটি হয়েছে। একদল কর্মী পাশ দিয়ে চলে গেল। শরীরে চুলে জড়িয়ে আছে পাটের ফেঁসো। সারাদিনের খাটুনির শেষে সবাই যেন টলতে টলতে ঘরে ফিরছে। গায়ে মেশিনের গন্ধ। আইসক্রিমঅলারা

ফিরে চলেছে খালি গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে। গরমের দুপুর সব আইসক্রিম খেয়ে ফেলেছে।

পথের দিকে তাকিয়ে পথ চলেছি। রাস্তার পাথরের বেশ একটা মন কেমন করানো রঙ থাকে। ভারি বিষণ্ণ। কেবলই যেন বলতে থাকে, জীবন কঠিন-কঠোর। কিন্তু সুন্দর। শুকনো কিন্তু পবিত্র। ঝনঝনে। ঘিঞ্জি এলাকা শেষ হয়ে গেল। বিশাল বিশাল গাছের জটলা। তলায় ঘন ছায়া তীর্থযাত্রীর মতো বসে আছে জটলা করে। গাছের ফাঁকে উঁকি মারছে গঙ্গার আকাশ। ভিজে ভিজে বাতাস। ধর্মের গন্ধ। পথটা ডান দিকে ঘুরে আবার সোজা হাঁটা দিয়েছে।

আপন মনে গান গাইতে গাইতে হাঁটছি। হঠাৎ কে যেন ডাকল, 'পিন্টুদা।' ঠিক যেন বেলা শেষের পাখির মতো গলা। মিষ্টি। সুরেলা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। এখানে কে আমাকে ডাকতে পারে! গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তৃষা। তার বগলে ছোট্ট একটা কাপড়ের পুঁটলি। তৃষাকে দেখে মনটা আমার ধক্ করে উঠল। সেই ধারালো চকচকে পুতুলের মতো মুখ। বাঁশির মতো নাক। ঝিনুকের মতো গায়ের রঙ। পাতলা পেঁয়াজের খোসার মতো গায়ের চামড়া। পদ্মফুলের মতো চোখ। চামরের মতো এক মাথা চুল। মুক্তোর মতো দাঁত। সেই তৃষা। এমন মেয়ে ইংরেজী গল্পের ছবিতে পাওয়া যায়। তৃষা কেমন করে এ-দেশের একটা গরিব পরিবারে এসে জন্মালো বলতে পারব না। তবে তৃষার রূপ দেখে অনেকেই চমকে যায়। তৃষাও নাকি আমারই মতো অপয়া। তৃষা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক বছরের ব্যবধ্যানে তার বাবা আর মা মারা গেছেন। গোটা সংসারটাই ভেঙে চুরে খানখান। তৃষাকে কিন্তু তার একমাত্র ভাই ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। দু'জনে মিলে, সৎপথে থেকে সংসার চালাবার চেষ্টা করেছে। ছোট্ট একটা তেলেভাজার দোকান দিয়েছে। দোকানটা সাংঘাতিক জমে উঠেছে।

তৃষা একটা কমলালেবু রঙের স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরেছে। আমার সামনে বড় বড় গাছের তলায় যেন একজন পরী দাঁড়িয়ে আছে।

তৃষা বললে, 'অবাক হয়ে কি দেখছ?'

'তোমাকে। তোমাকে দেখলে আমার কান্না পায় তৃষা।'

'কান্না পায় কেন?'

'তুমি এত সুন্দর কেন হলে তৃষা।'

তৃষা লজ্জায় মুখ নিচু করল।

'সত্যি তৃষা, ভগবান মনে হয় তোমাকে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন।'

'তোমাকেও তাই। তোমাকে কত সুন্দর দেখতে জানো কি? ঠিক দেবতার মতো।'

এইবার আমার মাথা নিচু করার পালা। তৃষা আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে আলো পড়ে তৃষার চুল সিল্কের মতো চকচক করছে।

আমি বললুম, 'তৃষা, আমার বাইরেটা সুন্দর হতে পারে, ভেতরটা যা-তা। কুৎসিত।'

'নিজেকে নিজে চেনা যায় না পিন্টুদা। আমি তোমাকে চিনে গেছি। পিন্টুদা তোমার আংটিটা নেবে না। এই দেখ আমার আঙুলে জ্বল জ্বল করছে।'

বাড়ি ছেড়ে ধানবাদে যাবার দিন আংটিটা তৃষার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার জন্য যখন চলেই যাচ্ছি তখন আঙটি আর কি হবে! তৃষাকে ভীষণ ভালবাসি, দেবার তো আমার কিছুই নেই, একমাত্র আঙটিটা ছাড়া।

'আঙটিটা তোমার আঙুলেই থাক তৃষা।'

'জানো তো, মেয়েদের আঙুলে আঙটি পরালে বিয়ে করা হয়। তুমি না জেনেই আমাকে বিয়ে করে বসে আছ। দেখি তোমার আঙুল।'

আমার অনামিকাটি তৃষাব দিকে এগিয়ে দিতেই, সে আমার আঙুলে আর একটা আঙটি পরিয়ে দিল।'

'তুমি কোথায় পেলে এত সুন্দর, এত দামী একটা আঙটি।'

'ওটা আমার মায়ের ছিল। মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগে আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমাকে দিলে কেন?'

'আমাকে মনে রাখবে বলে। ধরো আমাদের বিয়েটা হয়েই রইল। তুমি জানলে, আমি জানলুম, সাক্ষী এই কৃষ্ণচূড়া গাছ।'

তৃষা হাসছে! পাতলা ছুরির মতো এক জোড়া ঠোঁট। তার ফাঁকে মুক্তর মালার মতো এক সার দাঁত। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল তৃষাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে। বেশ কোনও এক পাহাড়ী জায়গায়, যেখানে আকাশের গায়ে পাহাড় লেগে থাকে। নদী বয়ে যায় টলটলে জলে নীলের ছায়া নিয়ে। যেখানে দুঃখ নেই কোনো। নেই মৃত্যু। সে তো অনেক পরের কথা।

'তৃষা, আসল বিয়ের তো অনেক দেরি। সেই কবে আমার লেখা-পড়া শেষ হবে! কবে আমি চাকরি করব। তারপর। ততদিনে কত বছর পার হয়ে যাবে! কত কি বদলে যাবে।'

'তুমি আর আমি না বদলালেই হল। মানুষ কি খুব বদলায় পিন্টুদা! যে যেমন সে তেমনই থাকে। তুমি শুধু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বড় হয়ে যাও। রোজ তোমার সঙ্গে একবার যেন দেখা হয়। আর আজকের কথা কেউ যেন না জানে। এ শুধু তোমার আর আমার জীবনের কথা। সিন্দুকে দলিলের মতো থাকবে। সময় এলে বের করে সকলকে দেখান হবে।'

'ধরো দশ বছর পরে যদি পালটে যাও।'

'আমি পালটাবো না। কেন জানো, তোমার মুখের ছাপ আমার ভিতরে বসে গেছে। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি তোমাকে। যেন দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি ক্লাসে। দেয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড। সেই বোর্ডের সামনে আবার তুমিই দাঁড়িয়ে আছ। তুমিই পড়াচ্ছ।

'এর মানে কি?'

'মানে হল, অভাবের জ্বালায় আমার লেখা-পড়া তো তেমন হল না। পরে তুমিই আমাকে পড়াবে। তাই বলছি, তোমার সব

কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নাও। তুমি দেখে নিও, তোমার খুব ভাল হবে। তুমি খুব বড় হবে।'

'কি করে বুঝলে?'

'আজই আমাকে এক সাধু বলছেন, তুমি রাজরাণী হবে মা। আমাকে রাণী হতে হলে তোমাকে রাজা হতে হবে। সাধু বললেন, ছেলেবেলায় যারা কষ্ট করে, বড় হলে তারা সুখী হয়। আমার সুখ মানে তোমার সুখ। এখন বলো, তুমি এই পথে যাচ্ছ কোথায়!'

'তুমি বলো, তুমি আসছ কোথা থেকে।'

'সম্পর্কে আমার এক মাসী থাকেন ওই ও-ধারে শ্মশানের কাছে। মোটামুটি বড়লোক। তাঁর মেয়ের জামা-টামা ছোট হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে দেন। সেইসব আনতে গিয়েছিলুম। এই দেখ না বগলে পোঁটলা বেঁধে নিয়ে চলেছি। এখন দিনকতক বেশ চলে যাবে। এইভাবেই চলে গেলে হল। তারপর তো ভীষণ ভাল দিন আসবেই আসবে। আমি যাই। দাদা ওদিকে একা দোকান সামলাচ্ছে। মনে রেখ তুমি কিন্তু এখন আর একা নও। তোমার একটা তুমি আছে। সে হলুম আমি।'

তৃষা চলে গেল হনহন করে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলেছে। সেই আলোতে তৃষাকে মনে হচ্ছে সোনার মূর্তি। মনে হচ্ছিল, আমিও ফিরে যাই ওর সঙ্গে। ভয় পেয়ে গেলুম। সবাই দেখবে। আমার বাড়িতেও পৌঁছে যাবে খবরটা। শুরু হয়ে যাবে ছিছি। ছিছিকে আমি আর ভয় পাই না। ভয় হয় তৃষাকে কেউ কিছু যেন না বলে। এমনিতেই অনেকে বলে, মেয়েছেলের সর্বনাশা রূপ ভাল নয়। আমাদের পাড়ার কিছু চরিত্রহীনের নজর তৃষার ওপর পড়েছে। আমি জানি। আমি শুনেছি তাদের কথা। বিশ্রী, অশ্লীল। ওদের গুলি করে মারা উচিত। ওরা জানোয়ার। তৃষার জন্যে আমার ভয় করে। ওকে একা একা ঘুরতে দেওয়া উচিত নয়। মানুষ এখন সব পারে।

॥ দুই ॥

আমি জানতুম এইরকমই একটা কিছু হবে! ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ করে অসম্ভব ভাবলে ভবিষ্যৎ ভাল না হয়ে খারাপই হয়। ছেলে, ছেলে করে আমার বাবার অসম্ভব ভাবনার ফল যে এইরকমই হবে তা আমি জানতুম। আমি যেন রেসের ঘোড়া, আর আমাব পিঠে জকির মতো আমার বাবা। আর আমার মা যেন ঘোড়ার মালিক। কাগজে যেমন ছবি বেরোয়। ঘোড়া রেসে জিতেছে। পিঠে জকি। লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ঘোড়ার মালিক। এক মহিলা। বব চুল। সিল্কের শাড়ি। মিসেস জালান। ঘোড়ার নাম লাকি প্রিন্স। ছবি ছাপা হয়ে গেল।

চারটে মাস গুম মেরে ছিলেন। হল না, কিছুই হল না। পৃথিবী চার মাস এগিয়ে গেল। ছেলে-ঘোড়া এক পা-ও এগলো না। তার ওপর দুর্ঘটনায় জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু। গুমরে গুমরে, ভেতরে ভেতরে বাবা পুড়ছিলেন। এই চার মাস আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। কাছে গেলে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত নেড়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিতেন, ভাগো, ভাগো, ভেগে পড়। যেন আমি একটা নর্দমা, একটা নরক। আমি সরে আসতুম। বাবাকে ওই সময়টায় একজন বিশ্রী, একগুঁয়ে লোক বলে মনে হত। মনে মনে বলতুম, ঠিক করছেন না আপনি। আপনি এত জ্ঞানী, আপনি একজন শিল্পী, সুন্দর বেহালা বাজান, আর এইটুকু বোঝেন না। ঘৃণা ঘৃণা হয়ে ফিরে আসে। কর্কশ ব্যবহার ফিরে আসে কর্কশতম ব্যবহার হয়ে। একটু আনন্দে থাকলে, সুখে থাকলে মানুষের ভালোই হয়। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। কি করা যাবে!

বাবা অফিস থেকে ফিরে এলেন। যা কখনও করেন না, তাই করলেন। কোনও রকমে গায়ের জামাটা মাত্র খুলতে পারলেন।

শুয়ে পড়লেন বিছানায়। শুয়ে পড়লেন বললে ভুল হবে। টলে পড়ে গেলেন খাটের একপাশে। ডাক্তার ডেকে আনলুম সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আমিই অপরাধী। মনে হচ্ছিল, সত্যই আমি খুনী। আমার জন্যে গোটা সংসারে একটা কালো ছায়া নেমে এল। আমাকে সবাই ঠেলে-ঠুলেই যেন অপরাধী করে দিল। আমার ভেতরটা ক্রমশ পাথরের মতো হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে বুকের সমস্ত নিঃশ্বাস জমে পাথর হয়ে গেছে। দুঃখ আর নেই। এখন যেন শুধুই সহ্য করা। বিছানায় বাবা শুয়ে আছেন। চোখ দুটো স্থির, অনড়। সমস্ত ভাব, ভাবনা যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই রয়ে গেছে। সমস্ত কথা বন্ধ। ডাক্তারবাবু মুখের ওপর বলে গেলেন—একে বলে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। ধরেই নিন লস্টকেস। এইভাবে যদ্দিন থাকবেন ততদিন থাকবেন। সেবাই একমাত্র ওষুধ।

আমাদের বাড়িতে সেবার লোক কোথায়। মায়ের শরীর নড়বড়ে। একেই বলে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়া। বাবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম বহুক্ষণ। আমার চোখে তাঁর চোখ ঠেকে আছে। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে। মনে হয় কিছু বলার চেষ্টা করছেন। চার মাসের অনেক কথা জমে আছে। পুরো চারটে মাস আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। দুঃখে, অভিমানে। না বললেও বলার কথা তো অনেক ছিল। আমি তাঁর ছেলে। ছেলে বলেই তো রাগ করেছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন, আমি তাঁর গর্ব হয়ে উঠি। হতে পারিনি সে তো আমারই দোষ।

বাবার চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কথা যেন নেমে এল জল হয়ে। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না। মনে হচ্ছে আমার ভেতরটা ফেটে যাবে। বলার কথা না বলে আমার জীবন থেকে আমার প্রিয় মানুষটি চলে যাবেন! রাগ তো একদিন কমতই, তখন ভারি গলায়, স্নেহ আর শাসন মিশিয়ে আমাকে ডাকতেন আবার, পিণ্টু। কত আদরই তো পেয়েছি। আমরা যখন বিদেশে

বেড়াতে গেছি তখন তিনি প্রাণের বন্ধু। হাসি-গান-গল্প। আমরা ক্রিকেট খেলেছি। ব্যাডমিন্টন। দৌড়ের প্রতিযোগিতা। পাহাড়ে চড়া। নদীতে স্নান। কোমর ধরে সাঁতার শেখানো। আবার বেড়াতে বেড়াতেই পড়ানো। আমার জীবনটা খোঁড়া হয়ে গেল। আমার আর কেউই রইলেন না।

বিশু বলেছিল, মন চঞ্চল হলে, মাটির দিকে তাকিয়ে চোখের পলক না ফেলে দাঁড়িয়ে থাকবি। দেখবি ভাল লাগবে। বেশ একটা বল পাবি মনে। আমি সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলুম ঘাসের দিকে তাকিয়ে। অনেক ভয়, তবু ভয় কিছুটা কমে এল। সংসার কে চালাবে! আমার লেখাপড়ার কি হবে! মা বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে আসছেন, চিকিৎসার একগাদা টাকা কে যোগাবে! ভয়ের শেষ নেই। ভাবলেই ভয়।

ঠিক সময়েই বিশু এসে গেল। বিশু চশমা নিয়েছে। ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে বিশুকে। বিশুর ডান হাতে পুরু ব্যাণ্ডেজ। আমার পিঠে হাত রেখে বললে, 'সব শুনেছি। ভাবিসনি আমি তোর পাশে আছি। সব সময় মনে রাখবি তোর আগেই আমার জীবনের ওপর দিয়ে এইসব চলে গেছে। আমাকে গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল আমার ভাগ্য। আমি কিন্তু ছাতু হয়ে যাইনি। শোন, এখন তোকে মন দিয়ে বাঁচতে হবে, যেটা সত্যদা আমাকে শিখিয়েছেন। তুই সত্যদার কাছে চল। কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে গেলে বাঁচার মতো বাঁচা যায়। দাপটে বাঁচা। মাথা তুলে বাঁচা। জীবনটাকে শক্ত করার জন্যে যত দুর্ঘটনা আসে। তুই আজই চল।'

'তোর হাতে কি হয়েছে?'

'ও কিছু না।'

'আমি কিন্তু তোকে সব কথা বলি, তুই চেপে যাচ্ছিস।'

'তাহলে শোন, আমার বদরাগী মামা, মাইমাকে মারার জন্যে লাঠি তুলেছিল। মাইমাকে বাঁচাতে গিয়ে লাঠিটা সপাটে আমার হাতে। হাড়ে চিড় ধরেছে, তাই প্লাস্টার। ভদ্রলোকরা যখন

ছোটলোক হয় তখন তাদের সামলানো যায় না। অনেকটা পেট খারাপের মতো। ছেড়ে দে ওসব কথা। সত্যদার কাছে চল! আকাশে মেঘ জমেছে। চিড়িক, চিড়িক বিদ্যুতের রেখা পশ্চিমের আকাশে। অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। বৃষ্টি এলো বলে। সত্যদার বাড়িতে ঢোকা মাত্রই বৃষ্টি নেমে গেল বড় বড় ফোঁটায়। বইয়ের পাহাড়ের মাঝখানে সামান্য একটু জায়গা বের করে সত্যদা বসে আছেন। ধুতি আর গেঞ্জি পরে। সাধুর মতো স্নিগ্ধ চেহারা। ফর্সা রঙ। অসম্ভব সুন্দর একটা মুখ। কপালটা জ্বলজ্বল করছে। ওরই মধ্যে একটু জায়গা করে আমরা দু'জনে বসলুম। একটা ঘর নিয়ে সত্যদা একা থাকেন। ঘরের বাইরে ছোট্ট একটু দালান, সেইখানেই রান্নার ব্যবস্থা। নিজেই রাঁধেন। সেই রান্নাই তখন চেপেছে।

সত্যদা বললেন, 'আজ আমার স্বপাকের দফারফা হল। প্লাবনে সব ভেসে গেল।'

বিশু বললে, 'আমি গিয়ে ছাতা ধরবো?'

'কোনও দরকার নেই। ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও। বরাতে খাওয়া থাকলে হবে, না থাকলে হবে না।'

সত্যদা বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সোজা হয়ে বোসো। এইটাই হল প্রধান শর্ত। মেরুদণ্ড সোজা করে, স্ট্রেট হয়ে বসব। কোনও মতেই সামনে ঝুঁকবো না। কুঁজো হবো না। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস মেরুদণ্ড দিয়েই চলাচল করে। সোজা, খাড়া মেরুদণ্ডই হল শৌর্য আর বীর্য। মনে থাকে যেন।'

বিশু বলল, 'আজ ও খুব চঞ্চল মন নিয়ে এসেছে সত্যদা। বাবার সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিস। সংসারে আর কেউ নেই।'

'তার মানে ফ্রন্ট লাইনে চলে এসেছে। এইবার সামনা সামনি লড়াই। তা ভয়টা কিসের! পৃথিবীর নিয়মই তো, হয় লড়ো না হয় মরো। মরতে যখন আমরা কেউই চাই না, তখন লড়তে হবে। মনে আমরা কেউই কাপুরুষ নই। যা হবার তা হবেই। এরই মাঝে

আমাদের বাঁচতে হবে। জীবনকে পিঠ দেখাবো না। সারেণ্ডার নট।'

সত্যদা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ দুটো যেন সার্চ লাইটের মতো। আমার ভেতরে যেন ঢুকে যাচ্ছেন সত্যদা। আমার ভেতরের সমস্ত ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন যেন। আমি যেন ক্রমশই তাঁর শক্তির মুঠোয় চলে যাচ্ছি।

সত্যদা বললেন, 'জীবনে আর অঙ্কে কোনও তফাৎ নেই পিণ্টু। অঙ্কের সমস্যার মতো জীবনের সমস্যারও সমাধান খুঁজতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়। দেখ, যে যাই বলুক সাধারণ মানুষের জীবনের পেট্রল হল টাকা? টাকার হিসেবে তৈরি করতে হবে জীবন-পরিকল্পনা। বাবা অসুস্থ। এমন অসুখ, ভাল না হওয়াটাই স্বাভাবিক। এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন তিনি চলে যাবেন আমাদের ছেড়ে। তাঁর যে রোজগার ছিল, সেই রোজগার থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে। তার মানে তোমাদের পেট্রল কমে যাবে। এখন দেখতে হবে ট্যাঙ্কে কতটা পেট্রল আছে। তার মানে সঞ্চয় কতটা আছে!'

'সত্যদা, আমি যে লেখা-পড়া করব বলে এসেছি। এত হিসেব নিকেশ কেন আসছে?'

'ধীরে বৎস ধীরে। আগে সংসার, আগে ভাত-ডাল খেয়ে বাঁচা। তারপর লেখা-পড়া। এ-কালের লেখাপড়া বিনা পয়সায় হয় না। এক-এক সাবজেক্টের জন্যে এক-একজন শিক্ষক। যত উঁচুতে উঠতে চাইবে ততই খরচ। সে রকম বুঝলে তোমাকে রোজগার আর লেখাপড়া চালাতে হবে একসঙ্গে।'

'রোজগার! আমাকে কে চাকরি দেবে সত্যদা! চাকর-বাকর হওয়া ছাড়া আমি আর কি কাজ করতে পারবো সত্যদা!'

'শোনো, সে ভাবনা আমার, আগে তুমি তোমার বাড়ি সামলাও। তোমার মাথার ওপর এখন অনেক দায়িত্ব। বাবার চিকিৎসা। টাকা পয়সার ব্যবস্থা। বাবার অফিসে গিয়ে বলা। তাঁরা কি ভাবে কি করবেন জানা দরকার। আমরা তোমার পেছনে আছি। প্রয়োজনে সামনেও যেতে পারি। তবে যতটা পার নিজেই সামলাও। যত

ধাক্কা খাবে ততই শক্ত হবে। শক্ত পৃথিবীতে শক্ত মানুষেরই স্থান। দুঃখ থেকেই আনন্দ খুঁজে নাও। সেইটাই জীবনের সাধনা। আমার দিকে তাকাও। বড-বড় চোখ। পলক ফেলো না।'

সত্যদার দিকে তাকালুম। চোখে চোখে ঠেকাঠেকি হয়ে গেল। কি যেন একটা শক্তির তরঙ্গ ধীরে ধীরে আমার ভেতর চলে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। যখন আবার আমি আমাতে ফিরে এলুম তখন বৃষ্টি থেমে আকাশে ফ্যাকাসে মতো একটা চাঁদ বেরিয়েছে। আকাশের তলার দিকে দৈত্যের মতো একটা মেঘ ঝুলে আছে। ভিজে ভিজে বাতাস। গা শির শির করছে।

সত্যদা আমাদের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ফিরে যাবার সময় বললেন, 'পিন্টু, আজ থেকে তুমি অন্য মানুষ হয়ে গেলে। তোমাতে আর আমাতে বয়েস ছাড়া কোনও পার্থক্য রইল না।'

বিশু বললে, 'ব্যাপারটা তুই বুঝতে পারলি ?'

'না, রে ! কি একটা হল ; কিন্তু কি হল আমার কোনও ধারণা নেই। তবে ভীষণ হালকা লাগছে, শোলার মতো। মনে কোনও ভয় নেই, চিন্তা নেই। অদ্ভুত লাগছে। কি ব্যাপার বল তো !'

'একে কি বলে জানিস, আমি বদল। তোর আমিটাকে তুলে নিয়ে সত্যদার আমিটাকে বসিয়ে দিয়েছেন। সত্যদার ইচ্ছাই তোর ইচ্ছা বলে মনে হবে।'

'তার মানে আমি ক্রীতদাস হয়ে গেলুম।'

'না ক্রীত ইচ্ছা, ক্রীতমন। ভয় পাচ্ছিস ? ভয় নেই। দেখ না, কি হয় ! আমার কি খারাপ হয়েছে !'

রাস্তার যেখানে, যেখানে বৃষ্টির জল জমেছে, সেখানে সেখানে, ছোট ছোট চাঁদের আলোর পুকুর আলোর তৈরি হয়েছে, যেন কেউ আয়না ভেঙে পথের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে। গোঁসাইদের বাড়ির পাঁচিলে মাধবীলতায় থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। জল তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে হীরের নোলকের মতো।

বাবার শিয়রে মা বসে আছেন গালে হাত দিয়ে চুপ করে। আমি

বাবার পায়ের দিকে বিছানার একপাশে বসলুম। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খুব মৃদু গলায় বললেন, এত রাত পর্যন্ত তুমি ছিলে কোথায়? এখনও শোধরাতে পারলে না নিজেকে!'

আমি চুপ করে রইলুম। মনে মনে হাসলুম। শত্রুভাব এখনও গেল না।

মা বললেন, 'বঠঠাকুর ছিলেন, এ-সংসারের লক্ষ্মী। তিনিও গেলেন, একে একে সব যেতে বসেছে। আমি এখন কি করি! আমার মাথার ওপর যে কেউ নেই!'

ফস্ করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কেন, ভগবান আছেন।'

মা বললেন, 'আগে ছিলেন, এখন আর নেই।'

'ও, তোমার অভিমানের কথা। বিপদেই ভগবান। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।'

'শুনে শুনে মানুষের কান পচে গেছে। ও-সব আমাকে আর শোনাতে এস না।'

'আমার বিশ্বাস।'

'ভগবানকে বিশ্বাস না করে নিজেকে বিশ্বাস করলে অনেক মঙ্গল হত। সব কিছুর মুলে তুমি। তুমি যদি বাড়ি ছেড়ে না পালাতে...''

'তুমি আর পুরনো কাসুন্দি ঘেঁট না মা। যা হবার তা হয়ে গেছে। যা হচ্ছে, সেইটাকেই দু'জনে মিলে সামলাবার চেষ্টা করি এসো। তুমি তো বললে, নিজের ওপর বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসেই কাজ হোক। প্রথম কথা বাবার সেবা আর চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হবে? এই ভাবে, দু'জনে দু'মাথায় বসে কথা কাটাকাটি করলে তো কিছু হবে না। টাকা-পয়সা কোথায় কেমন কি আছে বলো, সেই মতো ব্যবস্থা হবে।'

'টাকা-পয়সা না থাকলে ব্যবস্থা হবে না?'

'তুমি কিন্তু আবার বাঁকা দিকে চলে যাচ্ছ।'

'আমি বলতে চাইছি ছেলে হয়ে তোমার কোনও কর্তব্য নেই?'

'নিশ্চয় আছে; কিন্তু আমি এখনও ছাত্র। আমার কোনও রোজগার নেই।'

'তুমি যখন বাড়ি থেকে পালাতে পেরেছিলে তখন তুমি 'রোজগারও নিশ্চয় করতে পারবে।'

'মা, আমি ইচ্ছে করে পালাইনি। আমি পালিয়েছিলুম, রাগে, দুঃখে, অপমানে। তোমরা আমাকে একদিনের জন্যেও ভাল কথা বলোনি। উঠতে, বসতে, কেবল বকেছ, ধমকেছ। আমি সন্ন্যাসী হব বলে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। এখন দেখছি ফিরে না এলেই ভাল হত। তোমাদের ছেলে মানুষ করার কোনও যোগ্যতা নেই। তোমরা লোভী, তোমরা স্বার্থপর, তোমরা হিংসুক, তোমরা অন্যের ভাল সহ্য করতে পারো না। তোমরা প্রতি কথায় বিশুর উপমা দাও; কারণ বিশুর ভাল তোমরা সহ্য করতে পারো না। তুমি বেশ ভালই জানো, বাবা আর ভাল হয়ে উঠবে না, তোমাকে আর আমাকেই লড়াই করতে হবে। তুমি কিন্তু আমাকে সহ্য করতে পারো না। কেন পারো না সে তুমিই জানো।'

মা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করলেন। মায়ের কান্না দেখে আমার আনন্দই হল। বহুদিন মা আমাকে কাঁদিয়ে এসেছেন। আজ মায়ের কান্নার দিন। মা যখন বাবাকে শান্ত করতে পারতেন, তখন উল্টোটাই করেছেন। কিছু হল না, কিছু হল না বলে বাবাকে উত্তেজিত করেছেন। আর কেবলই বলতেন—জ্যাঠামশাইয়ের আদরে আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। বঠঠাকুর ছেলেটার মাথা খাচ্ছেন। এর ফলে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কে একটা চিড় ধরেছিল। মা আমার জ্যাঠাইমাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ জ্যাঠাইমা ছিলেন মায়ের চেয়ে সুন্দরী ও শিক্ষিতা। এখন বুঝতে পারছি, কেন জ্যাঠামশাই আমাকে অমন উতলা হয়ে হাসপাতালে, হাসপাতালে খুঁজতে ছুটেছিলেন। তিনি জানতেন আমাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে সমস্ত দোষটা জ্যাঠামশাইয়ের ঘাড়ে এসে চাপত। এমনও হতে পারে, জ্যাঠামশাই গাড়ি চাপা পড়েননি, গাড়ির তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। আমার বাবা এই মাকে যে খুব একটা সহ্য করতে পারতেন, তা নয়। বেশির ভাগ সময় গম্ভীর হয়েই থাকতেন। তবু আমার মা। আমার কর্তব্য মাকে সম্মান করা, ভক্তি করা।

॥ তিন ॥

বাবার সমস্ত কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বেশ অবাক হয়ে গেলুম। বাবা বেশ বড়লোক। চারদিকে অনেক টাকা জমা আছে। ব্যাঙ্কে পোস্টাপিসে। খুব দুঃখ হল—কিছুই ভোগ করতে পারলেন না। সবই পড়ে থাকবে।

সত্যদা বললেন, 'তুমি কি ওই টাকা ভোগ করতে চাও? তাহলে তোমার জীবনটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি ওই অনুপার্জিত টাকাটা ওড়াতে শিখবে। পাঁচটা বন্ধুবান্ধব এসে জুটবে। চরিত্রটা খোয়াবে। জানো তো বাঙালীর ধর্ম হল, এক পুরুষ সঞ্চয় করে, আর এক পুরুষ এসে উড়িয়ে দেয়, তার পরের পুরুষ ভিক্ষে করে।'

'সত্যদা, আমার সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই। তাছাড়া ও টাকা আমার নয়। আমি ভিক্ষে করেই বড় হব। বড় হয়ে ভিক্ষে করতে চাই না। যা করব নিজের চেষ্টায় করব। অপরের সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই।'

'গুড। তোমার এই আত্মবিশ্বাসটাই আমি চেয়েছিলুম। মনে করো তোমার কিছুই নেই। তোমার তুমি ছাড়া কেউ নেই। জানো তো পাখিকে কেউ উড়তে শেখায় না, পাখি নিজেই উড়তে শেখে। তুমি ওই টাকায় বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করো, আর যা থাকবে, সেটা রেখে দাও তোমার মায়ের জন্যে। তাঁর সারা জীবনের ব্যবস্থা।'

'বাবাকে কোনও নার্সিংহোমে রাখবো কি?'

'কখনই না দু'হাতে জানপ্রাণ দিয়ে পিতার সেবা করো। জানবে পিতা আর মাতার আশীর্বাদ ছাড়া কোনও মানুষ বড় হতে পারে না। যাও তোমার ওই সুখী সুখী আয়েসী ভাবটা ছেড়ে পিতার সেবায় লেগে পড়। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা হি পরমন্তপঃ। কোনও নার্সও রাখবে না। সব নিজের হাতে করবে। দেখবে, শক্তি পাবে, অসীম শক্তি।'

'আমার লেখা-পড়া, আমার পরীক্ষার কি হবে!'

'তাও হবে। চব্বিশ ঘন্টায় একটা দিন। সময়টা কিছু কম নয়, যদি ঠিক মতো হিসেব করে খরচ করতে শেখো। বাবার ঘরটাকেই লেখাপড়ার ঘর করে নাও। পড়বে আর সেবা করবে। মনে মনে বাবাকে বলবে—দেখুন আপনি যা ভালবাসতেন, আমি তাই করছি। আপনার নীরব আশীর্বাদ যেন আমাকে ঘিরে থাকে।'

সন্ধেবেলা, হঠাৎ তৃষা এসে হাজির। দরজার সামনে তৃষাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে আমি কি রকম হয়ে গেলুম। যেন একটা ছবি দেখছি। আবার ভয়! এখুনি মা হয়ত অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন।

মা বললেন, 'কে তুমি?'

আমি কিছু বলার আগেই তৃষা বললে, 'আমি তৃষা। পিন্টুদা আমার বন্ধু।'

মা আমার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অদ্ভুত এক কথা বললেন, 'তুমি তো ভারি সুন্দর!'

তৃষা এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মাকে প্রণাম করল। যখন মাথা তুলল, তৃষা কাঁদছে, 'এ কি হল, কাকাবাবুর এ কি হল!'

মা হঠাৎ তৃষাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতে লাগলেন। মা চেয়েছিলেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। পারছিলেন না, কারণ ঘৃণা। এখন সামনে তৃষাকে পেয়ে গেছেন। চাপা আবেগ উৎলে উঠেছে। তৃষা ঠিক সময়ে এসেছে। আশ্চর্য মেয়ে। কেউ তো আসেনি। ও কেন এল! দেবীর মতো কোনও কোনও মেয়ে পৃথিবীতে হঠাৎ এসে যায়। মা আঁচল দিয়ে তৃষার চোখ মুছিয়ে নিজের চোখ মুছলেন। ঘরে এত সুন্দর একটা নাটক হচ্ছে, বাবা তার কিছুই জানলেন না। টিপটিপ করে স্যালাইন আর গ্লুকোজ চলেছে। একটু পরেই ডাক্তারবাবু আসবেন।

তৃষা বললে, 'কাকিমা, আপনাদের বাড়িতে লোকজন কম।

শুনেছি আপনার শরীর খারাপ, আমি আপনাদের সাহায্য করতেই এসেছি। মনে করুন, আমি আপনার মেয়ে। নাই বা হলুম পেটের মেয়ে।'

মা বললেন, 'তুমি কে মা? কোথায় তোমার বাড়ি?'

'আমার বাড়ি আপনি চিনতে পারবেন না মা। এক সময় আমাদের বাড়ির খুব নামডাক ছিল। তখন সবাই চিনতো। এখন চেনা লোকও আমাদের চিনতে পারে না। কারণ আমাদের অবস্থা পড়ে গেছে। সংসারে আমার এক দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। দু'জনে মিলে একটা তেলেভাজার দোকান চালাই।'

'তোমার আর কেউ নেই কেন মা?'

'আমরা সেবার হীমাচলে বেড়াতে গেলুম। বেঁচে ফিরে এলুম আমরা দু'জনে। বাবা আর মা পড়ে রইলেন খাদের ভেতরে। কারোর কারোর সঙ্গে ভগবান এইরকম ব্যবহারই করেন।'

'যেমন আমাদের সঙ্গে করছেন।'

তৃষা অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে রইল। রান্নাঘরে ঢুকে যা পারলো সামান্য কিছু রেঁধে দিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল আমাকে, 'তুমি অন্যরকম ভেবো না। আমি আর দাদা এইরকমই করি। দাদা বলে এইটাই আমাদের ব্রত। মানুষের সেবা। কাল থেকে সারারাত আমি থাকবো, যাতে তোমরা একটু ঘুমোতে পারো। পিন্টু, একটু শক্ত হও।'

আমি অবাক হয়ে গেলুম। তৃষা আমাকে দাদা বলছে না। নাম ধরে ডাকছে। যেন আমার দিদি।

'তোমাকে আর দাদা বলবো না। কেন জানো? তোমার আর আমার এক বয়েস। এক স্কুলে পড়লে এক ক্লাসেই পড়তুম। আমরা বন্ধু। শোনো তোমার অনেক আগেই একের পর এক বিপদ এসে আমাদের শক্ত করে দিয়ে গেছে। যা আসে তা আসে।'

'তৃষা, তুমি এত সুন্দর কথা কি করে বলছ?'

'শুনবে তাহলে, বিপদের পর বিপদ, অভাব, অপমান, আমার

বয়েস বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাছাড়া মেয়েরা একটু পাকাই হয়।'

তৃষাকে কিছুটা এগিয়ে দিতে গেলুম। যে-রাস্তায় ওদের বাড়ি সেই রাস্তাটা খুব নির্জন। এ-পাড়ার ছেলেরা ক্রমশই বুড়োদের মতো হয়ে যাচ্ছে। মদ খায়, গাঁজা খায়, মেয়েদের সিটি মারে। হাত ধরে টানে অনেক রকমের পাপকাজ করে। কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। দল বেঁধে এসে খুন করে যাবে। দেশের অবস্থা এই রকমই হয়েছে। কি করা যাবে!

কিছুদূর যাবার পরই দেখি ব্রিজের ওপর সত্যদা দাঁড়িয়ে আছেন। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। সত্যদা কি মনে করবেন! তৃষার মতো সুন্দরী মেয়ে আমার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে হাঁটছে। রাতও হয়েছে বেশ। এখুনি বলবেন হয়তো—'বাঃ পিন্টু! তোমার আর লেখাপড়া হবে না। মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে শিখে গেছ!'

আমার হাঁটার বেগ কমে এসেছে। সত্যদা এগিয়ে এলেন। এসে, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এত রাতে, তৃষার সঙ্গে চললে কোথায়?'

'তৃষাকে আপনি চেনেন?'

'চিনবো না! তৃষা তো আমার ছাত্রী। ভালই হয়েছে, তোমাদের জন্যেই বোধ হয় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এই পথটা মোটেই সুবিধের নয়। চলো এগিয়ে দিয়ে আসি।'

তৃষা বললে, 'আমি কাকাবাবুকে দেখতে গিয়েছিলুম।'

'ভালই করেছ। ওদের একটু দেখাশোনা কোরো। পিন্টুর মায়েরও তো শরীর ভাল নয়।'

'হ্যাঁ, সত্যদা। আমি সেই কারণেই আরো গিয়েছিলুম।'

গোটা পথের কোথাও আলো নেই। অন্ধকার যারা পছন্দ করে, ইট মেরে সব বাল্ব ভেঙে দিয়েছে। সত্যদা বললেন, 'পিন্টু তোমাকে একটু মার্শাল-আর্ট শিখিয়ে দেবো। এ-যুগে বাঁচতে গেলে আত্মরক্ষার কায়দা শিখতে হবে।'

'সত্যদা, আপনি কি জানতেন আমরা আসবো!'

'শোনো, আমি বিশুকে পড়াচ্ছিলুম, হঠাৎ মনে হল, যাই একটু ঘুরে আসি। পথ আমাকে এই দিকেই টেনে নিয়ে এল। এখন তুমি যা ব্যাখ্যা করবে করো।'

কিছু দূরে অন্ধকারে গোটাকতক আগুনের ফুটকি বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। সিগারেটের আগুন। আমার জীবনে এইরকম একটা ঘটনা আছে। হঠাৎ হায়নারা ছুটে এসে আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছিল। ব্লেড চালিয়েছিল গালে। সেই থেকেই সিগারেটের আগুন অন্ধকারে জ্বলতে নিবতে দেখলে আমার হাতের মুঠো শক্ত হয়। সত্যদা তৃষাকে আড়াল করলেন। জায়গাটা আমরা পেরিয়ে গেলুম। নাকে হুহু করে মদের গন্ধ ভেসে এল।

সত্যদা বললেন, 'কাকে দোষ দোবো! এই অবস্থার জন্যে আমরাও কম দায়ী নই। দেশের একটা অংশ এগিয়ে যাচ্ছে যে গতিতে, আর একটা অংশ পিছিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই গতিতেই। দেশটা কাপড়ের টুকরোর মতো ছিঁড়ে ফালা হয়ে যেতে বসেছে।'

ফেরার পথে সত্যদা বললেন, 'তৃষাদের পাড়াটা ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওকে কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। আমার যে একটা মাত্র ঘর। তোমাদের বাড়িতে ওকে রাখো না।'

'আমি কে সত্যদা। সবই মায়ের ইচ্ছা।'

'তোমার মাকে বুঝিয়ে বলো না।'

'আপনি বলুন না। তৃষার দাদা রাজি হবে তো!'

'ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করবো। তৃষার ওপর বহু শয়তানের নজর। ওর কিছু হয়ে গেলে সহ্য করতে পারবো না।'

রাত অনেক হয়ে গেল। সারা পাড়া ঘুমে কাদা। মা আর আমি জেগে বসে আছি। বাইরে চিৎকার করছে একপাল কুকুর। দমকা বাতাসে জানালার পাল্লা দুলে উঠছে। মায়ের মাথাটা থেকে থেকে ঢুলে পড়ছে। পাশের ঘরের বিছানায় মশারি টাঙিয়ে এসে মাকে বললুম, 'তুমি একটু শুয়ে নাও। আমি বাবার কাছে আছি।'

'শোবো কি রে! শোয়া যায়, না শোয়া উচিত!'

'উচিত, অনুচিত জানি না, তুমি একটু শুয়ে নাও। তা না হলে তুমি নিজেই অসুখে পড়ে যাবে। এখন তুমিও যদি পড়ে যাও, তাহলে খুব খারাপ হবে।'

মা টলতে টলতে উঠে গেলেন। আমি বাবার মাথার কাছে বসলুম। টিক্‌টিক্ করে ঘড়ি চলছে। বাবার এতদিনের সঙ্গ সেই টেবিল-ক্লক। যার অ্যালার্মের শব্দে আমাদের সকলের ঘুম ভাঙতো। বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। শরীর চাদরে ঢাকা, নিথর, নিস্পন্দ। ডাক্তার বলে গেছেন, একে বলে কোমা। জীবন আছে; কিন্তু চেতনা নেই। মাথার যে-অংশে চেতনা থাকে, সেই অংশটা বিকল হয়ে গেছে। আমি বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলুম, 'বাবা আমি পিন্টু।' কতবার বললুম। মনে, মনে আশা হঠাৎ যদি ভগবান বাবাকে সুস্থ করে দেন। আমার ডাকে বিছানায় যদি উঠে বসেন, আমি অমনি পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চাইবো। আমার পালিয়ে যাওয়ার অপরাধের যে ক্ষমা চাওয়া হয়নি।

॥ চার ॥

বাবা, তাঁর ডায়েরিতে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন—'জানবে, মানুষের একটি মাত্র ছেলে হওয়া মহাপাপ। ইংরেজিতে বলে, ওয়ান চাইল্ড সিন। সেই পাপের ফলভোগী আমি। খুব একটা উদাসীন হতে পারি না, এটাও আমার চরিত্রের এক মহা দোষ। নিজেকে নিয়েই বেশ মজায় থাকার অভ্যাস আমার নেই। আমার সমস্ত সুখ, সকল আনন্দ লুকিয়ে আছে তোমার ভেতরে। যেখানে যা কিছু ভাল দেখি, সুন্দর দেখি, গৌরবের দেখি, মহৎ দেখি, সবই মনে করি তোমাতে ফুটে উঠুক। আকাশে যত তারা, সবই যেন তোমার আকাশে গুণ হয়ে ফুটে ওঠে। নিজের কোনও উচ্চাশা নেই, সমস্ত আশার প্রতিমূর্তি তুমি। তুমি বড় হবে। বড়, আরও বড়। গাছের মধ্যে যেমন গর্জন, মানুষের মধ্যে সেইরকম তুমি। স্বাস্থে, সৌন্দর্যে, চারিত্রিক গুণে, শিক্ষায়, সেবায়। নৃপতির মতো হয়ে উঠবে তুমি। অচল, অটল, ধার্মিক। বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যেন জাহাজের গতি। খাড়ি থেকে নদী, নদী থেকে অনন্ত সমুদ্রে। প্রথম দিকটায় একজন পাইলটের প্রয়োজন হয় জাহাজকে সমুদ্রে তুলে দেবার জন্যে, যাতে চরায় না আটকে যায়। পিতা সেই পাইলট। মানবপোতকে জীবন-সমুদ্রে মুক্তি দেয়। সমুদ্রে ক্যাপ্টেনের নিজের কেরামতি। নিজের শিক্ষা, নিজের চরিত্র। সেখানে প্রয়োজন সাহস, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, বিচার। আমার চরিত্রের দোষ—আমি বড় আবেগপ্রবণ। আমার রাগের চেয়ে অভিমানই বেশি। নিজের অক্ষমতার ওপর অভিমান। সবাই বলে, বাপকা বেটা। কোথায় সেই ছেলে, যে বাবার সমস্ত গুণের অধিকারী হয়ে বাবাকেও অতিক্রম করে যাবে। পিতার সমস্ত অহঙ্কার তার পুত্র। সেই অহঙ্কার আমি তৈরি করতে পারেনি,

সে আমারই অক্ষমতা। সেই গ্লানি আমার কাছে অসহনীয়। সবাই বলেন, ভেবো না, ভেবো না, যা হবার তা হবে। আমার পুরুষকার লাগে। আমি বিশ্বাস করি, চেষ্টায় কি না হয়। একশো ভাগ না হোক চল্লিশ ভাগ হবে। জীবনকে ছেলেবেলা থেকেই বাঁধতে হয়। বাঁধন দিতে হয়। একবার আমি শিমুলতলায় বেড়াতে যাচ্ছিলুম। কারমাটার স্টেশানে দেখি এক দেহাতী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে খাটো কাপড়, নীল জামা। তার কাঁধে শতরঞ্চি মোড়া বিছানার একটা বাণ্ডিল। দড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা। সেই পোঁটলা আর লাঠিটি সন্তর্পণে বগলদাবা করে মানুষটি সাবধানে হেঁটে চলেছে। এই দৃশ্যটি আমি ট্রেনের জানলায় বসে দেখেছিলুম। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, এই তো উপমা। জীবনকে এইরকম সাবধানে, বেঁধেছেঁদে, আঁকড়ে ধরে এগোতে হয়। আলগা দিলেই চলে যায় নিজের আয়ত্তের বাইরে। ওই শতরঞ্চিটা হল আদর্শ। প্রথমে আদর্শের মোড়কে জড়াতে হবে। এরপর দড়ির বাঁধন— সংযম, নিষ্ঠা, সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, সম্ভাবনা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সাধনা প্রভৃতি দিয়ে কষে বাঁধতে হবে। আর ওই লাঠিটা হল শিক্ষা। এই চিত্রটি চোখের সামনে ধরে রাখতে পারলে সকলেরই উপকার। মানুষ পৃথিবীতে আসে বিকাশের জন্যে। নষ্ট হবার জন্যে নয়। মাটিতে বীজ ফেললে চারা হয়, সামান্য পরিচর্যায় গাছ হয়, ক্রমশ বড় হতে থাকে, ফুল হয়, ফল হয়। কোনও গাছ ইচ্ছে করে নিজেকে নষ্ট করে না। তার স্বাভাবিক প্রবণতাই হল, ফল-ফুলে নিজেকে ভরিয়ে তোলা। মানুষ কিন্তু নিজেকে নষ্ট করে। নিজেকে মেরে ফেলে। বড় হবার বিশাল সম্ভাবনা নিজের আলস্যে হারিয়ে বসে। মানুষ দেহের ব্যায়াম করে। ভাল শরীর হয়। মনের ব্যায়ামই আসল ব্যায়াম। মনের জোরেই মানুষ এগোয়। সেই মনকে একাগ্র করো। ভীষণ একটা জেদ আনো। এই কথাগুলোই তোমাকে আমাকে বলার ছিল। সামনাসামনি বলতে চাই। পারি না। অভিমানে আমার কথা আটকে যায়। আমি গম্ভীর হয়ে

যাই। আমার মুখ কঠিন কঠোর দেখায়। তখন কিন্তু আমি কাঁদি। ভেতরে ভেতরে কাঁদি। বাবা হওয়া বড় কষ্টের। ভীষণ এক দায়িত্ব। পুত্রই তো মানুষের পিতা। দূর থেকে তোমাকে যখন দেখি তখন মনে হয় নিজেকেই যেন দেখছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, মৃত্যু আমার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। না-বলা কথা লেখা রইল তোমারই জন্যে। তোমার মঙ্গল কামনায়।'

বাবা রইলেন না। গভীর রাতে নিঃশব্দে চলে গেলেন অমর্ত্যলোকে। মাথার কাছে বসেছিলেন মা। মায়ের পাশে তৃষা। পায়ের কাছে আমি। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। বাবার পায়ে হাত বোলাতে গিয়ে দেখি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখ দুটো কাঁচের মতো স্থির। কব্জির কাছে নাড়ীতে আঙুল টিপে দেখি জীবন-ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবল শব্দে টেবিল-ঘড়িটা চলছে। মুখ তুলে তাকালুম। মায়ের মুখ। লাল পাড় শাড়ি। সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। সব সাদা হয়ে যাবে একটু পরেই। পৃথিবীর কোনও কিছুই পাল্টাবে না। যা ছিল, যেমন ছিল, সব ঠিক সেইরকমই থাকবে। সকালে পুব আকাশে সূর্য উঠে, পুবের জানালা দিয়ে যেমন আলোর ধারা ফেলে ঠিক সেইরকমই ফেলবে। জানালার ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝিরিঝিরি পাতায় আলো নাচবে। রোজ যেমন নাচে।

কারোকে কিছু না বলে আমি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। চোখের সামনে মাঝরাতের তারা ছড়ানো আকাশ। বড় নিজের মনে হল। পৃথিবীর মানুষের চিরসঙ্গী। অনুমান করার চেষ্টা করলুম, কতক্ষণ আগে বাবা ওই পথে চলে গেছেন! তাঁর রথ কি এখনও দেখা যাচ্ছে! শেষ স্বর্ণ নিশান। একটু ধোঁয়ার রেখা! তৃষা বুঝতে পেরেছিল। আমার পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে হাত রেখে বললে, 'চলে গেলেন?'

এতক্ষণ আমার কিছু হয়নি। তৃষার কথায় আমার বুক ফেটে গেল। ভীষণ জোরে, বড় বড় ফোঁটায় যেন বৃষ্টি এল। আর ঠিক

সেইরকম ঘরের ভেতর থেকে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা এত রাতে দু'জনে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালি কেন ? বাতাস লাগবে।'

আমি কোনও রকমে বললুম, 'তৃষা মাকে সামলাও।'

অন্ধকার পথ ধরে কেউ আসছেন। অন্য সময় হলে ভূতের ভয়ে দৌড় লাগাতুম। তখন আমার কোনও ভয় ছিল না। এমনও মনে হচ্ছিল, আমিও যদি যেতে পারি, যেভাবে বাবার হাত ধরে বেরাতে যেতুম গড়ের মাঠে! সত্যদার গম্ভীর গলা—'কে পিণ্টু না কি ?'

আমি হতবাক। গলার কাছে যে-কান্নাটা ঠেলে উঠেছিল নেমে গেল। এত রাতে সত্যদা!

'সত্যদা আপনি ?'

'কি হল জানো, বসে বসে বেশ অঙ্ক কষছিলুম, হঠাৎ খাতার পাতায় বড় বড় দু'ফোঁটা জল পড়ল। তা মনে হল, যাই পিণ্টুর একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। কিছুটা পথ এসেছি, মাথায় ঝাপটা মেরে উড়ে গেল সাদা মতো একটা পাখি। প্যাঁচা-ট্যাঁচা হবে। শোনো রাতটা কেটে যেতে দাও। আমাদের যাত্রা হবে ভোরে।'

সত্যদা ঘরে ঢুকে বললেন, 'মা এইবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি এসে গেছি তো!'

মা তখনও জানেন না, 'বাবা চলে গেছেন। মাকে নিয়ে তৃষা চলে গেল পাশের ঘরে। সেই রাতে দেখেছিলুম, মানুষ কত শক্ত হতে পারে প্রয়োজনে। সত্যদা পরে আমাকে বলেছিলেন—যে-ঈশ্বর দুঃখ দেন, যন্ত্রণা দেন, তিনিই দেন সহ্যশক্তি। যেমন জল পায় না বলে, মরুভূমিতে গাছ হয়ে যায় কাঁটা কাঁটা, মনসা গাছ।

বাড়িটা খালি হয়ে গেল। খালি হয়ে গেলেন আমার মা। মানুষ চলে গেলে অন্য মানুষ ঠিকই থেকে যায়। দিন-কতক তারা উদাস হয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জীবনের সুরছন্দ কেটে যায়। তারপর জীবন এসে হাত ধরে নাচাতে নাচাতে আবার তালে বসিয়ে দেয়। একে একে সবই ফিরে আসে। ফিরে আসে হাসি। যেমন দুটো ফুসফুসের একটা কেটে বাদ দিলেও মানুষ বেঁচে থাকে। এমন কি

সিগারেটও খেতে পারে। একটা শূন্যতা চাপা পড়ে থাকে ঘটনার পর ঘটনায়। ফোকলা দাঁতে জিভ চলে যাবার মতো, মন চলে যেতে পারে সেখানে, আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়। বেঁচে থাকাটা বড় দগদগে, রগরগে।

তৃষা আমাদের বাড়িতেই থেকে গেছে। মা তাকে ছাড়তে চাইলেন না। কাঁদতে কাঁদতে বললেন গত জন্মে এ আমার মেয়ে ছিল। সত্যদা তৃষার দাদাকে বললেন, 'শোনো বিকাশ, তৃষা বড় হচ্ছে। তার ওপর সুন্দরী। দিনকাল খুব খারাপ। ওকে আর দোকানে এনো না। তুমি একটা ছেলেটেলে রাখো। তোমার দোকান এখন বেশ জমে গেছে। ও একটা ভালো আশ্রয়ে থাক। ওকে আমি লেখা-পড়া শেখাই ভাল করে।'

তৃষা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সত্যদা বলেছেন, তৃষাকে তুমিও পড়াবে। পড়ালে নিজের শিক্ষা ভাল হয়। তৃষাকে আমি পড়াই। পড়াতে বসলেই অনুভব করি। আমার ভেতরে আমার বাবা জেগে উঠছেন। তিনি দুর্দান্ত শিক্ষক ছিলেন। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, যে-সব অঙ্ক আগে বুঝতেই পারতুম না, সেইসব অঙ্ক চটচট কষে ফেলছি। তৃষার কাছে আমি হারবো না।

সত্যদা বিদেশী বইয়ের ব্যবসা করতেন। ঘর ঠাসা বই। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে বই পুরে রোজ বারোটা একটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তেন। অফিসে অফিসে বাঁধা খদ্দের। সত্যদাকে সবাই ভীষণ ভালবাসতেন। সত্যদা বলে বলে বই দিতেন—এই বইটা আপনার পড়া উচিত। এই বইতে এই এই আছে। বইয়ের খবর সত্যদার মতো কেউ রাখতেন না। প্রকৃতই একজন জ্ঞানী মানুষ। সত্যদাকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন সেই কারণে।

মাঝে মাঝে আমিও সত্যদার সঙ্গে বেরোতে শুরু করলুম। আমার কাঁধেও একটা ছোট ঝোলা, কিছু বই। বইয়ের ওজন কম নয়। এই ভার বয়ে বয়ে সত্যদার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে তাঁর কিছু মনেই হয় না। সত্যদা বলতেন, 'আমরাও এক ধরনের গাধা।

ধোপার গাধা নই, মা সরস্বতীর গাধা। জ্ঞানের ভার বয়ে বেড়াচ্ছি।' সারাটা পথ আমরা নানারকম আলোচনা করতে করতে ঘুরে বেড়াতুম। কখনও মহাকাশে রকেট কোন বিজ্ঞানে ওড়ে, কখনও বিশ্বসাহিত্যের সেরা লেখক, কখনও দেশ বিদেশের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী। বাসে-ট্রামে মানুষ খ্যাঁচোর-ম্যাঁচোর ঝগড়া করছে তার মধ্যে আমাদের সমালোচনা চলছে—লিউইস ক্যারল গণিতজ্ঞ ছিলেন। মাঝে মধ্যে বাসে ট্রামেও জ্ঞানী মানুষ পাওয়া যেত। তাঁরাও আলোচনায় যোগ দিতেন। বাসের কণ্ডাক্টাররা সত্যদাকে শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন, আপনি উঠলে বাসের আবহাওয়াই পাল্টে যায়। বেশ কিছু কণ্ডাক্টার সত্যদার ছাত্র হয়েছিলেন। সপ্তাহে একদিন সত্যদার কাছে এসে তাঁরা নির্দেশ নিয়ে যেতেন। বাসে এঁদের কারোর সঙ্গে দেখা হলেই বাসটা স্কুল হয়ে যেত। সে বেশ মজা। কণ্ডাক্টার একদিকে টিকিট কাটছেন, আর একদিকে সত্যদার পড়ার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। বাসের ঝগড়াঝাঁটি মারামারি কিছুক্ষণের মতো বন্ধ হয়ে যেত। আমাদের স্টপেজ এলে সকলেই সশ্রদ্ধায় বলত—নামতে দিন, নামতে দিন। পেছন ফিরে হঠাৎ তাকিয়ে দেখেছি অনেকেই সত্যদাকে হাত জোড় করে নমস্কার করছেন।

সত্যদার সঙ্গে ওইভাবে ঘুরতে ভীষণ ভাল লাগত। কত জ্ঞানী-গুণী মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হত। হাইকোর্টের জজসাহেব। কোম্পানির ডিরেক্টর। বড় শিল্পী। কলেজের প্রিনসিপ্যাল। পত্রিকার সম্পাদক। কেউ ভীষণ গম্ভীর, কেউ হাসিখুশি, রসিক, আমুদে। সত্যদা বলতেন, 'সব শিখে নাও পিন্টু। আমার পরে তুমি। পড়াকে পড়া হবে, ব্যবসাকে ব্যবসা। কারোর দাসত্ব করতে হবে না। অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক হয়ে বসবে তুমি। তোমাকে আমি সেইভাবেই তৈরি করে দিয়ে যাবো।'

অনেক ঘোরাঘুরির পর খিদে পেলে, আমরা দু'জনে কোনও পার্কের গাছতলায় বসে ছোলাভাজা চিবোতুম। মাথার ওপর মেঘ

ভাসা নীল আকাশ। চারপাশ জ্বলজ্বলে সবুজ। সত্যদা জিজ্ঞেস করতেন 'পৃথিবীটা কেমন লাগছে তোমার পিণ্টু?'

'ভালই, তবে যে-যার-সে-তার। মানুষ বড় একা।'

'তা যা বলেছ! দুটো পৃথিবী পাশাপাশি ঘুরছে। একটা ভালবাসার পৃথিবী। ভালবাসতে না পারলেই বড় একা। স্বার্থের কুকুর পেছন পেছন তাড়া করবে। তুমি অবশ্য ভালবাসা পেয়ে গেছ। একজনকে ঠিক মতো ভালবাসতে পারলে সকলকেই ভালোবাসা যায়। ভালবাসার একটা নাড়ী থাকে মানুষের ভেতর। সেইটাকে একবার চালু করে দিতে পারলেই, মার দিয়া কেল্লা। ভালবাসা পেলে ভালবাসা আসে, যেমন বীজ ফেললে গাছ হয়, সার আর জল দিলে ফুল আসে গাছে। তৃষা মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগে?'

সত্যদা, আমার গুরুজন। এ প্রশ্নের আমি কি উত্তর দোবো! কেমন করে বলবো আমার পইতের আঙটিটা তৃষার আঙুলে, তৃষার আঙটি আমার আঙুলে। কেমন করে বলি তৃষার কোলে মাথা রেখে বাবার অসুখের সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এইসব কথা তো সত্যদাকে বলা যায় না। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম।

সত্যদা বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। জানো তো, তোমার মতো বয়সে আমিও একটা মেয়েকে ভালবাসতুম। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। বড়লোকের মেয়েকে ভালবাসতে নেই। তারা ভালবাসা বোঝে না, বোঝে ভাল থাকা। চলে গেল আমেরিকা আর ফিরলোই না। আমারও আর বিয়ে করা হল না। তা বেশ ভালই আছি। সংসার মানেই শত ঝামেলা। তৃষা মেয়েটা খুব ভাল। ভীষণ ভাল। তোমার জীবনটা সুখের হবে। প্রথম দিকে দুঃখ পেলে, শেষের দিকে সুখ হয়। এই বইয়ের ব্যবসাটা তোমাকে দিয়ে যাবো। তুমি পড়বে আর বিক্রি করবে। তৃষাকে আমি তৈরি করে দিয়ে যাবো। তোমার উপযুক্ত করে।'

তৃষা আর মা একঘরে একই বিছানায় শোন। আমি বাবার

ঘরটাই বেছে নিয়েছি। যত রাত বাড়ে ততই মনে হয় একটা কিছু জমছে। ঘরটা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে। বাবার খাট, বাবার লেখা পড়ার টেবিল যেন জীবন্ত। তিনি এসে বসছেন। বইয়ের যে জায়গাটা পড়ছিলেন, সেই জায়গাটা খুলেছেন। চশমার খাপ থেকে চশমা বের করছেন। আমি সব সাজিয়ে রাখি। বিছানার চাদর টানটান করে পাতি। বালিশের ওপর বালিশ সাজাই। মশারি ফেলে গুঁজে রাখি। তারপর নিজে পড়াতে বসে যাই। কোনও কিছু আটকে গেলে টেবিলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি। দু'তিনবার জিজ্ঞেস করার পরই আমার ভেতর থেকেই একটা উত্তর, একটা সমাধান বেরিয়ে আসে। আমি নিজেই তখন অবাক হয়ে যাই। আত্মা তাহলে আছে। মৃত্যুতেই মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না! মাঝ রাত পেরিয়ে গেলে তৃষা একসময় উঠে আসে পাশের ঘর থেকে। পেছন দিক থেকে ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে। তৃষা একটু লম্বা হয়েছে। আরও ফর্সা হয়েছে। কানের কাছে পাতলা ঠোঁট দুটো রেখে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'মহাশয়, এইবার কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাও। রাতের অপমান করিওনা। প্রত্যূষে আবার হইবে। তৃষার রেশমের মত চুল এরই মধ্যে কোমর ছাপিয়ে নেমে গেছে। সেই চুল ঝুলে পড়ত আমার বুকের ওপর। তখন আমার মনে হত, রাত কত সুন্দর! একটা ছেলে, একটা মেয়ে, নিকষ কালো রাত, তারার চুমকি, মধুর মতো মিষ্টি বাতাস। আমি বাবার বিছানার দিকে তাকিয়ে বলতুম—মৃত্যু আছে দুঃখ আছে, বিরহের দহন আছে, তবু জীবন কত সুন্দর। পৃথিবীতে নিজের জন্যে বেঁচে থাকার কোনও সুখ নেই। অন্যের জন্যে বাঁচতে হয়। বাবা চেয়েছিলেন আমার জন্যে বাঁচতে। ছেলেকে মানুষ করবো। আমি বাঁচবো তৃষার জন্যে। তৃষাকে সুখী করবো। তৃষা হল সুন্দর একটা ফুল।

আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেল। বিশু বললে, 'এইবার ঝিঁকি মারতে হবে পিন্টু। আর কোনও কথা নয়।' সন্ধ্যেবেলা বিশু চলে আসত আমাদের বাড়িতে। বাবার ঘরের মেঝেতে মোটা

শতরঞ্জি। শুরু হত আমাদের পড়া। বিশু মাঝে মাঝে বলত, 'তুই আমাকে পড়া।' তৃষা আমাদের জোগানদার কখনও মুড়ি চানাচুর, কখনও কখনও একটা লজেন্স, কখনও গরম তেলেভাজা। বিশু বলত, 'তোদের বাড়িতে এলে মনে হয় স্বর্গে এসেছি।' বিশু রাতে আর বাড়ি ফিরত না। সারা রাতই চলত আমাদের সাধনা। মাঝে মাঝে সত্যদা আসতেন। তখন আর জমে যেত আমাদের পড়া। একটা সময় মনে হত, লেখা-পড়ার মতো জিনিস নেই। সত্যদা বলতেন, পৃথিবীতে ছাত্র থাকাটাই আনন্দের। যতদিন ছাত্র থাকতে পারো, ততদিনই ভাল। খালি শিখে যাও। জ্ঞানের নেশায় আটকে থাকে।

পরীক্ষার ফল বেরোতে দেরি আছে। আমি এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলুম। সেই ঘটনাটা ঘটে গেল মাঝরাতে। তৃষা পড়তে বসেছিল আমার কাছে। অনেকক্ষণ লেখা-পড়ার পর শতরঞ্জির একপাশে তৃষা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। ছড়ানো চুলের ওপর ভাসছে তার পানপাতার মতো মুখ। কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা টিপ। মোমের মতো দুটো পা। মা আজকাল আর বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারেন না। পাশের ঘরে মা ঘুমিয়ে আছেন। আজকাল ঘুমের মধ্যেই মা কথা বলেন। বোঝার চেষ্টা করলেই বোঝা যায়। বাবার সঙ্গে কথা বলেন। বাবা ডাকছেন, মা উত্তর দিচ্ছেন। বাবা যেন কিছু খেতে চাইছেন না, মা অনুরোধ করছেন খেয়ে নেবার জন্যে। বাবা তেলেভাজা খেতে ভীষণ ভালবাসতেন তৃষার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মাথায় একটা গল্প এসে গেল। একটা মেয়ে আর দুটো ছেলের গল্প। তিনজনেই কিশোর। তিনজনেই বড় হয়ে উঠছে। কিশোরীর চোখের সামনে দুই কিশোর যেন রেসের ঘোড়া। দু'জনেই প্রাণপণ ছুটছে। কে হারে, কে জেতে। দৌড়ের পাল্লা নেহাত কম নয়। পাকের পর পাক মারছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। পায়ের ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়ছে। পায়ের

নালের সঙ্গে পাথরের ঘষায় চকমকি পাথরের মতো আগুনের ফিনকি। সুন্দরী কিশোরী একটি সোঁদাল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে আছে। ফুরফুর করে ঝরে পড়ছে হলুদ ফুল। কিশোরী পরনে চাঁপা ফুলের মতো পোষাক। গলায় একটা মুক্তোর মালা। যে-ঘোড়া জিতবে তার গলায় ঝুলিয়ে দেবে মুক্তোর মালা। ঘোড়া দুটো ছুটছে। একটা ঘোড়ার নাম পিণ্টু আর একটা ঘোড়ার নাম বিশু।

গল্পটা বেশ গুছিয়ে লিখে ফেললুম। ভোরের কাছাকাছি সময়ে গল্পটা শেষ হয়ে গেল। মনে হল অলৌকিক এক অনুভূতি। কি যেন একটা ঘটে গেল। জীবনের প্রথম অন্যায় কাজটাও বোধহয় করা হল সেই ভোরে। আকাশে পেঁয়াজের খোসার মতো আলো। বাতাস হিম হিম। তৃষা চিৎ হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাতলা ঠোঁট দুটো অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। আমি মনে মনে সংকল্প করে নিলুম, পিণ্টু-ঘোড়া জিতবেই। বিশু-ঘোড়া হারবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার ঠোঁট নেমে এল। আলতো করে ছুঁয়ে গেল তৃষার ঠোঁট। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ভীষণ দ্রুত হল। বুকের কাছটা ছলকে উঠল। ভয়, আনন্দ, নতুন এক অভিজ্ঞতা। তৃষা একবার একটু চোখ খুলল। ঠোঁটের কোণে খেলে গেল মুচকি হাসি। দু'হাত তুলে আমাকে ধরার চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তেই মনে হল, মা উঠে পড়েছেন। চারপাশে যত পাখি ছিল সব একসঙ্গে চিৎকার শুরু করেছে—ওরে ভোর হয়েছে। ভোর হয়েছে। রাস্তার কলে বালতি ফেলার শব্দ।

ওই দিনই সত্যদা আমাকে বললেন—'পিণ্টু আজ তুমি একদিকে যাও, আমি একদিকে। অনেক নতুন বই তুলেছি। ভাগাভাগি করে সকলকেই দেখাতে হবে। এইবার তোমার একটু একা একাই ঘোরা উচিত। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।'

সত্যদা আমাকে দিলেন, সাহিত্যের এলাকা। পত্র-পত্রিকার অফিসে সম্পাদক মহাশয়দের বই দেখাতে হবে। সকলের কাছেই আমি সত্যদার সঙ্গে আগে আগে গেছি। কেউ খুব অল্প কথায়

মানুষ, কেউ আবার ভীষণ বেশি কথা বলেন, হা হা করে হাসেন। ঘন ঘন সিগারেট খান। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে স্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে। তাঁর নাম সুদর্শন বন্দ্যোপাধ্যায়। গোলগাল, সুন্দর চেহারা। মধ্যবয়সী। আমাকে দেখলেই বলতেন—এই ছেলেটার দিকে নজর রাখা উচিত। দেখতে হবে এ কি করে! আমাদের একটা সাবজেক্ট। বলেই তিনি আমাকে বিশ্লেষণ করতেন—চোখ দুটো বড় বড। জল টলটলে, কিন্তু আগুন আছে। চেহারাটা নরম; কিন্তু ধার আছে। হাসলে মনে হয় কাঁদছে। সামনে বসে আছে; কিন্তু মনে হয় বহু দূরে। এ যেন সেই বাউলের গানের উপমা – ঘরের ভেতর চোর কুঠরি।

সেই স্বদেশ পত্রিকার সুদর্শনবাবুর কাছেই আগে গেলুম। তিনি বেশ ভাল মেজাজেই ছিলেন। মুখে সবে একটা পান পুরেছেন। সেই ভরাট মুখেই, জিভ ওল্টানো অবস্থাতেই বললেন, 'আরে, এসো এসো, জ্ঞানদাস এসো'। সুদর্শনবাবু মাঝে মধ্যে আমাকে জ্ঞানদাস বলেন। আমার ঝোলায় না কি জ্ঞান ভরা থাকে। আমাকে বসতে না বললে আমি বসি না। গুরুজনকে এই সম্মানটুকু দেখাতে হয়। সুদর্শনবাবু বললেন, 'বোসো, বোসো। চেয়ার টেনে বোসো।'

আমি বসলুম। তিনি ঢোঁক গিলে মুখ খালি করে বললেন, 'আজ অনেক খাদ্য এনেছ মনে হচ্ছে। দেখাও, দেখাও।'

পরপর সমস্ত বই বের করে তাঁর সামনে সাজিয়ে দিলুম। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আরে বাপরে আজ কি করেছ?'

একে একে বই দেখলেন। যা নেওয়ার বেছে নিলেন। বাকি বই সব ভরে ফেললুম আমার ঝোলায়। এইবার আমি উঠবো।

সুদর্শনবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে বেশ একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে! কি ব্যাপার?'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আমার একটা নিবেদন ছিল।'

'নৈবেদ্যটা কি ?'

ইতস্তত করে বললুম, 'একটা গল্প এনেছিলুম।'

'মরেচে, তুমিও লেখক হয়ে গেলে! দেশে আর পাঠক থাকবে না দেখছি। সবাই লেখক।' আমি লজ্জায় উঠে দাঁড়ালুম। সত্যিই তো, আমি লেখার কি জানি! তাছাড়া স্বদেশ একটা বড কাগজ। সেরা কাগজ। সেখানে আমার মতো অবোধ লেখক লেখা আনে কোন সাহসে! নমস্কার করে বললুম, 'আমি তাহলে আসি।'

'কি হল ? তোমার গল্প ?'

'আমি বোকার মতো বলে ফেলেছিলুম।'

'তাহলে এখন চালাক হয়ে দিয়ে দাও। কে বলতে পারে তোমার হাত দিয়ে ভাল জিনিস বেরোবে না! দাও, দাও।'

কাঁপা কাঁপা হাতে লেখাটা বের করে তাঁর হাতে দিলুম। প্রথম পাতাটায় চোখ রেখে বললেন, 'লেখা কেমন হয়েছে জানি না, তবে হাতের লেখাটা বেশ ভালই বাগিয়েছ। তোমার লেখা। আজই আমি পড়ে ফেলবো, কাল তুমি খবর নিও।'

প্রায় এক লাফে রাস্তায়। আরও দশ-বিশ জায়গায় যাওয়ার ছিল। সব ঘুরে, ব্যাগ খালি করে পার্কে এসে একটা গাছতলায় আরাম করে বসলুম। হাত-পা ছড়িয়ে। বইয়ের কম ওজন। সত্যদার সব বই বিক্রি করে দিয়েছি। আজ আমার দিন খুব ভাল। একটু দূরে আর একটা গাছের তলায় বসে একজন শিল্পী ছবি আঁকছিলেন। বেশ লাগছিল দেখতে। রঙে রঙ মিশে মিশে কি সুন্দর হচ্ছে। গাছ, সবুজ জমি, বসার আসন। দুটি লোক। সুন্দর পৃথিবী ছবিতে আরো কত সুন্দর হয়ে ওঠে! আমি যদি শিল্পী হতুম, প্রথমেই তৃষার একটা ছবি আঁকতুম। পরের দিন আর সুদর্শনবাবুর কাছে যাওয়া হল না। তার পরের দিন গেলুম। গম্ভীর মুখে সুদর্শনবাবু বললেন, 'বোসো।'

তাঁর মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলুম। ভীষণ রেগে গেছেন নিশ্চয়।

হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে টেবিল পেরিয়ে আমার কাছে এসে

দাঁড়ালেন। আমার ডান কানটা কষকষে করে ধরে বললেন, এ'চড়ে পাকা! গল্প লিখেছে। গল্প!'

লজ্জায়, অপমানে, জল এসে গেল আমার চোখে।

সুদর্শনবাবু বললেন, 'ওঠো। উঠে দাঁড়াও। বসে আছ কি বলে?'

আমি উঠে দাঁড়ানো মাত্রই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উত্তেজনায় তাঁর বুক হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। সুদর্শনবাবু আবেগ জড়ানো গলায় বললেন, 'কি গল্প লিখেছিস তুই! কি সাংঘাতিক গল্প!'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'তোর হবে। তোর সাংঘাতিক হবে। তবে একটা কথা, মাথাটা ঠিক রাখিস। দীন-হীনের মতো সাহিত্যের সেবা করে যা। কেউ তোকে আটকাতে পারবে না।'

আমার চোখ বেয়ে জল নামতে লাগল হু হু করে। মনে পড়ে গেল বাবার কথা—সাফল্যের চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। লক্ষ টাকা পেলেও ওই আনন্দ পাবে না। আমি সুদর্শনবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলুম। মনে হল আমার বাবাকেই প্রণাম করছি। মনে হল, আমার জীবনটা ভরে গেল কানায় কানায়।

সুদর্শনবাবু চেয়ারে বসে বললেন, 'গল্পটা পরের সংখ্যাতেই যাচ্ছে। আমার দেওয়া নামেই যাবে, জ্ঞানদাস।'

আমার হঠাৎ খুব ভয় এল মনে, 'একটা তো লিখে ফেলেছি কোনও রকমে, আর যদি না পারি?'

'খুব পারবে জ্ঞানদাস, খুব পারবে। জীবনে একটা স্থায়ী দুঃখ খুব সাবধানে, নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করো, জীবনে বঞ্চিত হও, নিঃসঙ্গতাকেই সঙ্গী করো, নিজেই নিজের হাত ধরো। শিল্পী মাত্রেই একা। একেবারে একা। সেইটাই সমস্ত সৃষ্টির উৎস ঈশ্বরকে বলো, সুখ আর শান্তি আমি চাই না। প্রভু যত পারো আমাকে ব্যথা আর বেদনা দাও। শিল্প একটা ব্রতের মতো। সেই ব্রত ধারণ করো।'

'আপনি যে আমাকে ভালবাসেন?'

'মূর্খ! কেউ তোমাকে ভালবাসবে, কেউ তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করবে। সবই তোমার জীবনের পাওনা। মানুষের দুটো পা। একটা সুখ, একটা দুঃখ। একটা ঘৃণা, একটা ভালবাসা। একটা মান, একটা অপমান। একটা ঠিক, একটা বেঠিক। জীবনকে দেখ। জীবন দিয়ে লেখো।'

চারটে বড় বড় সন্দেশ খেয়ে নেমে এলুম পথে। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার বাবা, আমার ভেতরে বসে কাজ করছেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক। ফেরার পথে সংকল্প করলুম—কারোকে বলব না। না সত্যদাকে, না তৃষাকে। জ্ঞানদাস ছদ্মনাম। কেউ জানতেও পারবে না।

গল্পটা বেরলো। সম্পাদক মহাশয় নাম রেখেছিলেন, 'লাট্টু'। লেখক জ্ঞানদাস। প্রথম সারির সমস্ত লেখক স্বাগত জানালেন নবাগত লেখককে। অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রশংসা বেরলো। সুদর্শনবাবু বললেন, 'ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকো। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। আর একটা গল্প লেখো। তারপরেই হাত দাও উপন্যাসে। এবারের পুজো সংখ্যায় তোমার উপন্যাস আমি ছাপবো। যে জীবন তুমি দেখেছ, সেই জীবনের কথাই তুমি লিখবে। তবেই বিশ্বাসযোগ্য হবে। জীবনের কাছে থাকবে। জীবনের ভেতরে থাকবে। জীবনের বাইরে নয়। তাহলেই হয়ে যাবে গ্রহান্তরের মানুষ। লেখা তোমার মহাশূন্যে ঘুরপাক খাবে, জমি পাবে না।'

আমার দ্বিতীয় গল্পের নাম হল 'ঘুরপাক'। সে আমার নিজেরই জীবন। একটা ছেলে জীবনের চাকায় ঘুরছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা। একটা সময় সে মেনেই নিচ্ছে, পেয়ে হারানো, হারিয়ে পাওয়া, এই হল জীবনের খেলা। স্থায়ী কিছুই নয়। পিছল জমিতে দাঁড়িয়ে থাকার কসরত।

দ্বিতীয় গল্পটা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল।

সুদর্শনবাবু বললেন, 'নাঃ তোমার হবে। অনেকেই কোনও রকমে একটা লিখে ফেলেন, তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যান। সাহিত্যও এক ধরনের সাঁতার। জীবন সমুদ্রে ঢেউয়ের দোলায় দোল খাওয়া। এইবারে একটু একটু করে রসিয়ে রসিয়ে উপন্যাসটা লিখে ফেল। বেশ জমিয়ে।'

মাধ্যমিকের ফল বেরলো। সময়টা আমার ভালই যাচ্ছে। আশাতীত ফল হল। বিশুকে অবশ্য ধরতে পারলুম না। বিশু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। আমি গোটাকতক লেটার পেলুম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের চোখে জল। বললেন, 'সেই পারলি, কেবল তুটো মানুষ হারিয়ে গেলেন। থাকলে কত আনন্দ হত।'

তৃষা বললে, 'তাঁরা ওপর থেকে দেখছেন ঠিকই।'

মা বললেন, 'এইবার তোমার পালা। তোমাকে ঘিরেও আমার অনেক আশা।'

সত্যদা বললেন, 'তুমি নামী কলেজে ভর্তি হতে পারো ; কিন্তু আমার মতে মধ্যবিত্ত কলেজেই ভর্তি হও। আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কাজ নেই। তোমার পথ অধ্যাপনার পথ।'

মনে মনে ভাবলুম সত্যদা ধরেছেন ঠিক। অধ্যাপক হলে লেখালিখির খুব সুবিধে হবে। আমি একটা প্রাচীন মধ্যবিত্ত কলেজে ভর্তি হলুম। আর কলেজে প্রথম দিন গিয়েই শুনলুম, ছেলেরা জ্ঞানদাসের লেখা নিয়ে আলোচনা করছে। তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। আমি যেন কিছুই জানি না। চুপচাপ শুনে গেলুম। আর শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। আমি তু'খণ্ড হয়ে গেলুম। একখণ্ডে আমি লেখক। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি এক ছাত্র। একজন খুব প্রাচীন, আর একজন তরুণ। কেউ কারোকে চেনে না। কে জ্ঞানদাস! প্রশংসা শুনে আমার সামান্যতম পুলকও হচ্ছে না। সকলেই ধরে নিয়েছে জ্ঞানদাস কোনও প্রবীণ লেখকের ছদ্ম নাম। দীর্ঘ সাধনার পর হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছেন। পেছনে একটা দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি আছে।

সত্যদাও আমাকে বললেন, 'হঠাৎ এক নতুন লেখক এসেছেন। সময় পেলে লেখা দুটো পড়ে নিও। নিছক গল্প নয়। ভাবায়। তোমার পড়া উচিত।'

হঠাৎ আমার মায়ের মাথায় একটা উদ্ভট চিন্তা ঢুকলো। চিন্তার উৎস একটা স্বপ্ন। বাবা মাকে ডাকছেন। ভোরের স্বপ্ন। একা আমার আর ভাল লাগছে না। তুমি চলে এসো। মায়ের কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, আমি আর বাঁচবো না। ডাক এসে গেছে। যাওয়ার আগে ছেলের বিয়ে দিয়ে যাবো।

'মা স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না। কারোর জীবনে হয়নি। ভাবনাটাই স্বপ্ন হয়ে আসে। এত তাড়াতাড়ি তুমি যেতে পারো না। যাবেও না।'

'স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না। ভোরের স্বপ্ন।'

'আজকাল কলেজে পড়তে পড়তে কেউ বিয়ে করে না মা। আমার সহপাঠীরা আমার গায়ে থুতু দেবে। লোকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারপর বিয়ে করে।'

'তোমার সারাজীবনের ব্যবস্থা তো তোমার বাবা করে রেখে গেছেন। সেদিক থেকে তুমি তো ভাগ্যবান বাবা।'

'কোনও মেয়ের বাবা আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। ও-সব সেকালে হত।'

'সে ভাবনা তোমার নয় আমার। মেয়ে, আমার কথা দেওয়া আছে।'

'তার মানে?'

'মানে, আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর মেয়েকে কথা দেওয়া আছে।'

'সেটা ভেঙ্গে দিতে হবে মা। মনে করো, আমার বিয়ে হয়েই গেছে।'

'তার মানে?'

'তোমার পুত্রবধু ও-ঘরে লেখাপড়া করছে এখন। আজ থেকে

পাঁচ বছর পরে সে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে তোমার ছেলের বউ হয়ে।'

মা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বললেন, 'অসম্ভব। তৃষা তোমার বোন। ওকে আমি মেয়ে হিসেবে মানুষ করছি।'

'ছেলের বউও মেয়ে। সে-ও তোমাকে মা-ই বলবে।'

'সেই মা আর এই মায়ে অনেক তফাত। দুটো দু'রকমের মা।'

'মা কখনও দু'রকম হয় না। মা বললে একজনকেই বোঝায় আর তিনি মা।'

'কথার মারপ্যাঁচ করার চেষ্টা করো না। তৃষা আর তুমি ভাইবোন।'

'তুমি জোর করে একটা সম্পর্ক তৈরী করার চেষ্টা করলে কি হবে। আমাদের নিজেদের একটা সম্পর্ক তৈরী হয়ে আছে।'

'এত দূর ? তা হলে তৃষার তো আর এ-বাড়িতে থাকা হয় না।'

'কেন হয় না ?'

'ও যদি তোমার বউই হবে তাহলে বিয়ের একটা প্রশ্ন আসছে। বিয়ে না করা পর্যন্ত সে তো বউ নয়। বিয়ের কনে আলাদা বাড়িতেই থাকবে।'

'এই তো বলছিলে তুমি আমার বিয়ে দেবে !'

'তোমার এখনও বিয়ের বয়স হয়নি।'

'ও তোমার ঠিক করা পাত্রীকে বিয়ে করলে বিয়ের বয়স হয়েছে, আর তৃষাকে বিয়ে করলে বয়স হয়নি। তোমার কোনও তুলনা হয় না মা। তুমি অদ্বিতীয়া। তোমার অদ্ভুত অদ্ভুত সব যুক্তির জন্যই তোমার সংসার আজ শূন্য। তোমার জন্যই আমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। জ্যাঠামশাই আমাকে আদরে আদরে বাঁদর করেছেন, এ কথা তুমি প্রায়ই বলতে। আর সেই কারণেই জ্যাঠামশাই আমাকে খুঁজতে ছুটেছিলেন হাসপাতালে, হাসপাতালে। যখন কোথাও পেলেন না, তখন তোমার ভয়ে নিজেকে গাড়ির তলায় ফেলে দিলেন।'

'কে বলেছে? কে বলেছে এ-কথা? তার মানে আমি খুনী?'

'তুমি আমাকে খুনী বলেছিলে। রেগে আমাকে গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিলে। সেই কাটা দাগ এখনও আমার কপালে। তুমি জানতে জ্যাঠামশাইকে তুমি কি বলেছিলে? আর জানতে বলেই তোমার অত রাগ হয়েছিল। তুমি আমার বাবাকে উদ্বাস্তু করে মেরেছ। তুমি সব জানো, সব বোঝো, তবু তোমার সব বিশ্রী জেদ, তোমার আমির অহঙ্কার গেল না। ছুটো মৃত্যুকে তুমি যত ভুলছ, তোমার পুরনো স্বভাব ততই জেগে উঠছে।'

মা উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। তৃষা ঘরে এসে বললে, 'আমাকে নিয়ে যখন অশান্তি, তখন আমি চলেই যাবো।'

মা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কারোকে যেতে হবে না, আমিই যাবো।'

'কোথায় যাবে তুমি? তোমার যাবার কোন জায়গা আছে?'

'বিধবা বুড়িরা চিরকাল যেখানে যায় ঘর-ছাড়া হয়ে আমি সেইখানেই যাবো।'

'এই শরীরে?'

'না হয় মরবো।'

'আর তোমার এই সম্পত্তি আমরা যক্ষের মতো আগলাবো; আর সারা জীবন লোকে আঙুল দিয়ে দেখাবে, ওই দেখ মাকে তাড়িয়েছে।'

আমার সেই গল্পটা মনে পড়ল—একটি লোক মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিল, ছাখো, আমি তো খুব খারাপ লোক ছিলুম, তা আমি এখন মরছি। মরার পর আমাকে তোমরা পেছনে বাঁশের গোঁজা দিয়ে হাটের কাছে প্রদর্শনী করে রেখ, খারাপ লোকের শাস্তি। গ্রামবাসীরা তাই করল; আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কাতায়লি থেকে রাজকর্মচারীরা গ্রামকে গ্রাম ধরে নিয়ে গেল খুনের দায়ে। আমার মাকে এই গল্পটা শোনাতে ইচ্ছে করছিল। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অসম্মান করে ফেলেছি। মায়ের মুখ থম মেরে আছে। বড় করুণ সে

মুখচ্ছবি। বড় অসহায় মহিলা। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। নিজের গোঁ আর জিদ ছাড়া।

মা বললেন, 'একটা কথা তুমি শুনে রাখো, তৃষাকে বিয়ে করে তুমি কোনও দিন সুখী হতে পারবে না। কেন জানো? তৃষার ওই সর্বনাশা রূপ। ও হল নায়িকা। কিন্নরী। সেকালে এইরকম মেয়েকে দেবদাসী করা হত।'

'একালে এইরকম মেয়েরা চিত্রাভিনেত্রী হয়। সুখেই ঘরসংসার করে।'

'করতে পারে, তবে এক স্বামীর সঙ্গে নয়। দ্রৌপদীর মতো পঞ্চ স্বামীর সঙ্গে।'

'তাহলে তোমার মতে তৃষার কি ব্যবস্থা করা উচিত?'

'ছেলের বউ না করাই উচিত।'

তৃষা বললে 'এই মুহূর্তেই আমি চলে যাবো।'

স্মরণ করিয়ে দিলুম, 'তৃষা আজ বাদে কাল তোমার পরীক্ষা। তুমি কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে উঠবে তুমি! তোমার দাদা হাসপাতালে। দোকান চালাচ্ছে তোমার দাদার বন্ধু। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে?'

'ভবিষ্যৎ তোমরাই তৈরি করছিলে। আমার আবার ভবিষ্যৎ কি! আমি তো পথের মেয়ে। পথ থেকে এসেছিলুম, আবার আমি পথেই ফিরে যাবো।'

তৃষা কাঁদতে লাগল।

মা বললেন, 'তোমাকে আমি একবারও চলে যেতে বলিনি।'

'তার চেয়েও বেশি বলেছ তুমি। বলেছ চরিত্রহীন।'

'তোমরাই প্যাঁচ করে বাঁকা মানে করছ। আমার মা আমাকে যা বলতেন, আমি তোমাদের তাই বলেছি। এতে তৃষা যদি রাগ করে চলে যেতে চায় তো যাক। তোমাদের দু'জনেরই এই বয়েসটা সুবিধের নয়। ঘি আর আগুন পাশাপাশি না থাকাই ভাল।'

'তুমি একটা ভুল করছ মা। আমি মার খাওয়া ছেলে, তৃষা

গরীবের মেয়ে। যে-সব মেয়ে উড়ে বেড়ায় তারা সব পয়সাঅলার ঘরের। চরিত্র খোয়াতে হলে টাকা চাই মা। ট্যাকের জোর থাকা চাই।'

'তোমার ব্যাখ্যা তোমারই থাক। আমি আমার মতে যেভাবে চলে এসেছি, চিরকাল সেই ভাবেই চলব।'

তৃষা পড়ার ঘরে চলে এল। বইপত্র মুড়ে বসে রইল করুণ মুখে। আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। পৃথিবী যেমন চলছিল সেইরকমই চলছে। আমাদের ভেতরে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেলেও বাইরেটা ঠিকই আছে। দোকানপাট, কেনাবেচা, লোকজন, হইহল্লা, হাসিঠাট্টা। আবার আমার ভাঙনের দিন এল। ঘর ছেড়ে ভেসে থাকার দিন। জ্যোতিষী ঠিকই বলেছিলেন, দেখ বাপু তোমার কোষ্ঠীতে গৃহসুখ নেই। তুমি সব পাবে, যশ খ্যাতি, সম্মান অর্থ, কিন্তু সারাটা জীবন তোমাকে জ্বলতে হবে।

বেশ তাই হোক। তৃষাকে বললুম, 'চলো।'

'কোথায়?'

'যেখানে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। আমার ওপর তোমার বিশ্বাস এখনও আছে তো? না, নষ্ট হয়ে গেছে?'

'আছে।'

'তাহলে চলো। যে অবস্থায় আছো সেই অবস্থায়। শুধু তোমার বই আর খাতাপত্তর নেবে।'

'মাকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না। মা বড় একা। ভীষণ অসহায়।'

'তাহলে তখন বললে কেন?'

'না ভেবেই বলেছিলুম। হঠাৎ। তোমার চেয়েও আমি মাকে বেশি ভালবাসি।'

তৃষা কেঁদে ফেলল। চোখ মুছে বললে, 'মাকে কার কাছে রেখে যাবো? আমার তো মনে হয়, স্বামী স্ত্রী হওয়ার চেয়ে, ভাইবোন হওয়া অনেক ভাল। তাহলে আমরা দু'জনেই মাকে পাবো। মাকে

বাদ দিয়ে কোনও কিছুই ভাবা যায় না, ভাবা উচিত নয়। তুমি একবার ভেবে দেখ। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।'

অবাক হয়ে তৃষার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমার নিজের মাকে তো আমি এই ভাবে ভালবাসতে পারিনি কোনও দিন। ভীষণ লজ্জা হল নিজের ওপর। মেয়েরা কত সহজে গুটিয়ে নিতে পারে নিজেকে? প্রেম, ভালবাসা, বিয়ে, কত কি ভেবে বসে আছি আমি। তৃষাকে অন্য কেউ বিয়ে করবে ভাবলে মনে হত, হয় আমি তাকে খুন করব, না হয় আত্মহত্যা করব নিজে। কোনও দিনই তৃষাকে আমি বোন হিসেবে ভাবতে পারবো না। তৃষা আমার প্রথম প্রেম।

সত্যদার কাছে গিয়ে আমার বইয়ের ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিলুম। সত্যদার হাঁটুতে কি হয়েছে হাঁটতে পারছেন না। আমাকে বলেছেন ঈশ্বরের আদেশ, সিট ডাউন, আর গেট আপ বলবেন কি না জানি না। তুমি বেশ ভালই করছ, তোমার ব্যবসা তুমি বুঝে নাও। এবার আমার ছুটি।

ঝোলাটা নিয়ে বেরোচ্ছি, সত্যদা বললেন, 'আজ তোমাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন?'

'পরে বলবো সত্যদা। আগে নিত্য টহলটা মেরে আসি।'

রাস্তায় বেরিয়ে জনসমুদ্রে মিশে গেলে নিজের সব কিছু বেশ হারিয়ে যায়। অনেকের মধ্যে আমি এক। ফেরিঅলার জীবিকাটা বেশ ভাল। দিনের শেষে সেই পার্কে এসে বসলুম। সেই গাছের তলায়। সারা দিনের খাদ্য এক টাকার বাদাম। মুখ চলছে, চলছে ভাবনা। তৃষাকে মনে পড়লেই ভেতরে এক হাজার তৃষ্ণার্ত দাঁড়কাক যেন খাখা করে ডাকছে। কেন মানুষ আত্মহত্যা করে বুঝতে পারছি। মানুষ মানুষের জন্যেই মরে। পুকুরের শান্ত জলে ঢিল ছোঁড়ার মতো শান্তিতে অশান্তিতে ঢেউ তোলে। তাইতেই আনন্দ। বিষম, বিপুল অহঙ্কার হল মানুষের আমি। আমির উৎপাত পাগলা হাতির উৎপাতকেও ছাড়িয়ে যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তৃষার জন্যে অপেক্ষা করব। হঠাৎ এমন একটা বিশ্রী চিন্তা এল,

নিজেই চমকে উঠলুম—মা যদি হঠাৎ মারা যান তাহলে কার কি ক্ষতি হয়! ভালই তো হয়। মহিলার অশান্তি ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে। এখনও এই অবস্থায় সংসারটা কত সুন্দর করা যায়! পারবেন না তিনি। মা পুড়তে আর পোড়াতে ভালবাসেন। এও এক ধরনের বেঁচে থেকে আত্মহত্যা।

চিন্তাটাকে মন থেকে ধাক্কা মেরে সরালুম। যে-ছেলে মায়ের মৃত্যু চিন্তা করে, সে তো পাপী। তার জীবনে তো ভাল কিছু হতে পারে না। এইরকম একটা কালো মন আমার ভেতরে আশ্রয় করে আছে! আর আমি জামা-কাপড় পরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছি! কিছুই না ভেবে বসে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা নামছে ইস্পাত কালো ডানা মেলে। হঠাৎ ভেতরে একটা আলোর ঝিলিক খেলে গেল। এই তো আমার উপন্যাসের বিষয়! সুদর্শনবাবু বলেছিলেন, জীবন দিয়ে লিখবে। এই তো সেই লেখা। শেষটা আমার জানা নাই, কিন্তু শেষটা আমি তৈরি করতে পারি। প্রথমটা হবে জীবনের মতো লেখা। জীবনের সঙ্গে লেখাকে মেলাবো, পরেরটা হবে লেখার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেবো। পরে জীবন যখন সময়ের সেই পথ ধরে হাঁটবে মিলিয়ে, মিলিয়ে নেবে। সত্যদা বলেন ঘটনা সব ঘটেই আছে, তুমি শুধু হেঁটে যাও।

উপন্যাস হয়ে ওঠার আনন্দে আমার সব দুঃখ হারিয়ে গেল। রাতে সত্যদা যখন জিজ্ঞেস করলেন—

'তোমাকে মেঘলা দেখছি কেন সকাল থেকে?'

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল? 'উপন্যাস।'

'উপন্যাস মানে?'

বিপদে পড়ে গেলুম। সত্যদা তো জানেন না, আমি জ্ঞানদাস। সে কথা প্রকাশ না করে বললুম 'সত্যদা আমি আমার জীবন দিয়ে একটা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছি।'

'তোমার জীবন তো এখনও শুরুই হয়নি।'

'ভেতরে, ভেতরে অনেকটা এগিয়ে গেছে সত্যদা।

'তার মানে তুমি বাঁচার চেয়েও বেশি বেঁচে আছ? দেখতে পাচ্ছ, নিজের চলার পথ?'

'পাচ্ছি সত্যদা।'

'বাঃ, অঙ্কে তাহলে তোমার মাথা খুলে গেছে। জীবন এক জটিল অঙ্ক। যাদের ভাল মাথা তারা দু'তিন ধাপ এগোবার পরই উত্তরটা দেখতে পায়। হাতে এক থাকবে কি শূন্য! সাধকের হাতে থাকে এক, সাধারণের হাতে শূন্য।'

একবার মনে হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে সত্যদার কাছেই থাকি এসে। দুটো কারণে তা আর করা হল না। প্রথম কারণ, সত্যদার একটাই মাত্র ঘর। অর্ধেক বইয়ে ঠাসা। জায়গা নেই বললেই চলে। একটা মানুষ শুতে পারে কোনও রকমে। দ্বিতীয় কারণ, আমি বাড়ি ছাড়া হলে তৃষাও চলে যেতে পারে। তৃষা এখন উঠতি বয়সের ছেলেদের নজরে আছে। সুযোগ পেলেই হাত ধরে টানবে। যা করার করে ভাসিয়ে দেবে জলে। কোনও রকমে আর পাঁচটা বছর আমাকে মাথা নিচু করে থাকতে হবে। থাকতে হবে গা বাঁচিয়ে, কায়দা করে। তারপর আমি ভাববো, কি করতে পারি আর কি না পারি। ততদিনে আমার ছাত্র জীবন শেষ হয়ে যাবে।

শুরু হল আমার উপন্যাস। এক মা, তার একমাত্র ছেলে। বেশ বড় মাপের একটা বাড়ি। অনেক ঘর। সবই প্রায় তালাবন্ধ। একটা ঘরে লাইব্রেরি। আইনের বই র‍্যাকে। মাঝখানে সেগুন কাঠের বিলিতি কায়দার টেবিল। বিশাল একটা চেয়ার। দেয়ালে চোখা চেহারার দুই মানুষের ছবি। মুখে সুখী সুখী ভাব। এঁরা দুই ভাই। আর এক দেয়ালে ভীষণ রাশ ভারি এক মানুষের প্রমাণ মাপের অয়েল পেন্টিং। এই পরিবারের বড় কর্তা। যে যার কর্মফল শেষ করে অমর্তধামের যাত্রী। একটি মেয়ে, অসাধারণ সুন্দরী। গোলাপী ফ্রক পরে যখন ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। ছেলেটি মেয়েটিকে ভালবাসে, মেয়েটিও ছেলেটিকে ভালবাসে। একদিন তারা চুক্তি করেছিল, বড় হয়ে বিয়ে করবে।

সাদা নরুন পাড় শাড়ি পরে যে ভদ্রমহিলা তারে শাড়ি মেলছেন, তিনি জীবনে হেসেছেন খুবই কম। যতদিন স্বামী বেঁচে ছিলেন, ততদিন শুধু গেল, গেল করেছেন, আর করেছেন, হল না, হল না। সমস্ত মানুষের জীবনকে তিনি আতঙ্কে রেখেছিলেন। সেই সব আতাঙ্কিত মানুষরা টপাটপ মরে গিয়ে পরম শান্তি পেয়েছেন। এই যে মহিলা শাড়ি মেলছেন, তিনি এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মহিলা; কারণ তিনি নিজের মত ছাড়া, পৃথিবীতে আর কারোর মত স্বীকার করেন না। নিজের মন ছাড়া, আর কারোর মনকে মন বলে মনেই করেন না। তিনি সব সময় সোজা পথ ছেড়ে, জটিল পথের চলাতেই অভ্যস্থ। সব ব্যাপারে নিজের মত খাটাতে গিয়ে এখন একেবারে নিঃসঙ্গ। মেয়েটি তাঁর নিজের মেয়ে নয়; কিন্তু মেয়ের মতো করে মানুষ করছেন। মেয়েটি অসহায়। অনাথই বলা যায়। এক দাদা ছাড়া তার আর কেউ নেই। সেই দাদাও এখন হাসপাতালে। তার নানা অসুখ। একটা তেলেভাজার দোকান দিয়ে বেশ ভালই চালাচ্ছিল এখন তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যের হাতে। মেয়েটি ওই মহিলাকে ধরে ধরে খুব সাবধানে ঠাকুর ঘরের দিকে নিয়ে চলেছে। কারণ সাংঘাতিক বাতে ভদ্রমহিলা প্রায় পঙ্গু। মেয়েটি এই মহিলাকে মায়ের চেয়েও বেশি ভালবাসে। মেয়েটিকে মহিলা প্রায় গ্রাস করে ফেলছেন। মেয়েটি শৈশবেই অনাথ। মায়ের স্নেহের কাঙাল। তার ফলেই এত সহজ হয়েছে ব্যাপারটা। মহিলা মা হবেন, শাশুড়ী হতে ঘোরতর আপত্তি। মেয়েটি ছেলেটির বোন হয়ে থাকতে চায়, বউ হতে আর রাজি নয়। যত তার বয়েস বাড়ছে, ততই তার মনের পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলেটি এখন সর্ব অর্থে অসহায়। মায়ের সঙ্গে তার বাক্যালাপ বন্ধ। মেয়েটির কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়। যখনই ভাবে মেয়েটি আর কারোর বউ হবে, ছেলেটির বুক ফেটে যায়। ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে।

প্রতিদিন গভীর রাতে এই বিচিত্র জীবন কাহিনী তিন-চার পাতা করে এগোতে লাগল। ঘণ্টা চারেক চেপে লেখাপড়া করি, ঘণ্টা

তিনেক চুটিয়ে লিখি। আমাদের বাড়ির তিন তলার ছাদের সেই নির্জন ঘর। যে-ঘরে বাবার বকুনি খেয়ে এসে লুকিয়ে, লুকিয়ে কাঁদতুম, আর জ্যাঠামশাই চুপিচুপি এসে আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন, বাপি খাবে চলো। বাপ, মা, গুরুজনেরা ছেলেদের একটু বকেই থাকেন। লিখতে, লিখতে দেখতুম পশ্চিম আকাশে তারামণ্ডল ঢলে পড়ছে। শেষ রাতের চাঁদ অসুস্থ মেয়েটির মতো ক্রমশই ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। বাতাস চরিত্র পরিবর্তন করে ভোরের শীতল আমেজ মাখছে। প্যাঁচারা মন খুলে ডেকে রাতকে বিদায় জানাচ্ছে। বিশু থাকলে পড়ে শোনাতুম। সে চলে গেছে রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। লিখতে, লিখতে ভাবি তৃষা হয় তো আসবে। এসে বলবে, রাত ভোর হয়ে এল, এবার শুয়ে পড়ো। আসে না। হয় তো মায়ের ভয়ে, নয় তো সে আর আমাকে ভালোবাসে না। ভালবাসা বড় ঠুনকো। ভীষণ ক্ষনিক। ভোরের শিশিরের মতো। রোদ উঠলেই বাষ্প হয়ে যায়। স্বার্থ হল সেই রোদ।

এই কাহিনী আমারই কাহিনী। আমারই পথ চলা। আমি নিজেকে বি. এতে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট করে দিলুম ইতিহাসে। তৃষাকে ঢুকিয়ে দিলুম ভাল একটা কলেজে। আর এক গুরু এনে মাকে দিয়ে দিলুম দীক্ষা। মাকে চালিয়ে দিলুম ধর্মের পথে। সেইটাই হওয়া উচিত—যার কেহ নাই তুমি আছ তার। বাড়িতে বয়ে গেল ধর্ম-কর্মের জোয়ার। সত্যদার বয়েস আরও বাড়ল। পরের জন্যে বাঁচতে গিয়ে মানুষটির নিজের বলে আর রইল না কিছু। ঘরের দেয়ালে নোনা ধরেছে। গাদাগাদা বইয়ের ওপর ঝুরঝুর শব্দে দেয়াল ঝরে পড়ে সারা রাত। ওই হল সময়। বালির ঘড়ি হয়ে ঝরছে! তারই মাঝে রাজার মতো বসে আছেন সত্যদা। কেবল বলছেন, দিন ছোট হয়ে আসছে, পড়ে নি, আর একটু পড়ে নি। বৃষ্টি এলে, ছাতা ধরেন উনুনে বসানো ভাতের হাড়ির মাথায়। থেকে থেকেই বলেন, দুঃখে যে হাসতে পারে সেই ধার্মিক। ছাত্ররা সারাদিন তাঁকে ঘিরে থাকে। তিনি বলেন, এরাই আমার বাহিনী। আমাদের

লড়াই অজ্ঞানের বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে। জ্ঞানই আমাদের ধর্ম।

পনের দিনে আমার উপন্যাসের চরিত্ররা অনেকেই অনেক দূর এগিয়ে গেল। লিখতে লিখতে, মাঝে মাঝে নিজেকে বিধাতা বলেই মনে হয়। ঘটনার পর ঘটনা তৈরি করছি, যেমন তিনি করেন। এই কাহিনীতে নিজের নাম রেখেছি মানব। মানবকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়েছি। একই বিভাগে পড়ে এষা। খুব শান্ত। ধীর। দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীর। কবিতার মতো। ধারালো মুখ। খাড়া নাক। অসম্ভব বড় বড় দুটো চোখ। যখন তাকায় মনে হয় আকাশ তাকিয়ে আছে। এষা আর তৃষা, শেষ উচ্চারণে একই রকম শোনায়। এষার দিকে তাকালে মানবের কবিতা আসে মনে। মনে হয় বহু পথ ধরে দুই পথিক হাঁটতে হাঁটতে আসছে, বহু অভিজ্ঞতা গায়ে মেখে। মানব তো আমিই। আমার মনও তো ঘুরছে। এক থেকে অন্যে। যে আগুনে ভাত রান্না হয়, সেই আগুনেই তো ডাল হয়, তরকারি হয়। জীবনের ঘটনাকে উপন্যাসে ঢুকিয়ে দিলুম। সেদিন কলকাতা ভেসে গেল বৃষ্টিতে। জল জমা সন্ধ্যার কলকাতার পথে গোলাপী ধোঁয়ার আঁচল উড়ছে। সব অচল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত ফুটপাথে এষা দাঁড়িয়ে, অদূরে মানব। হঠাৎ এষা জিজ্ঞেস করল, 'আজ কি করে ফিরবে?'

মানব বললে, 'আমিও ঠিক ওই একই কথা তখন থেকে ভাবছি, তুমি কি করে ফিরবে?'

'তুমি আমার কথা ভাবছ? নিজের কথা ভাবছ না?'

'আমার গুরু নিজের কথা ভাবতে শেখাননি।'

'কে তোমার গুরু? কোন আশ্রমে থাকেন?'

'কোনও আশ্রমে নয়। ভুবন দত্ত লেনের, নোনা ধরা একটা ঘরে।'

'সেটা কোথায়?'

'উত্তর কলকাতায়, আমার পাড়ায়।'

'তাহলে তুমি এই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি তো যাবে উত্তরে।'

'তোমার জন্যে। তুমি যেতে পারলে কি না, নিশ্চিত হয়ে তবেই তো আমি যেতে পারি।'

এষা অনেক কাছে সরে এল, 'মানব, তোমার সঙ্গে তো আমার তেমন পরিচয় নেই। আজই বোধহয় প্রথম এত কথা? তুমি আমার জন্যে এতটা ভাবো?'

অনেকেই অনেকের জন্যে ভাবে। কখনও জানা যায়, কখনও জানা যায় না। আজ একটা জানাজানি হয়ে গেল।

'আমার কাছে এ এক বিরাট আবিষ্কার।'

'এ আবিষ্কারে মানুষের কোনও উপকার হবে না।'

'আমার হবে। তোমার কথা আমিও মাঝে মাঝে ভেবেছি।'

'কেন?'

'পৃথিবীর প্রায় সব কেন-র জবাব আছে—দুটো কেন-র কোনও জবাব নেই। প্রথম কেন—মানুষ কেন আসে? দ্বিতীয় কেন—কেন একজন আরেকজনকে ভাবে?'

'চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কি ভাবে? সে যে অনেক দূর। হাঁটা তো যাবে না। আমি কি ভাবছি জানো, আমার বাবা অন্ধ। বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। তাই আমার ভেতরটা ছটফট করছে।'

'চলো, কিছুটা হেঁটে ধর্মতলা পর্যন্ত যাই। সেখান থেকে যা হয় একটা কিছু ধরা যাবে।'

'তোমার দূরত্ব যে বেড়ে যাবে। তারপর তুমি কি করে ফিরবে?'

'শোনো, তোমাকে ফেরাতে পারলে, তোমার ফেরার ভাবনাটা আমার মন থেকে নেমে যাবে, আমি তখন পাখির মতো হালকা। নির্ভার।'

মানব আর এষা হাঁটছে। থই থই জল। বিকল সব গাড়ি। ঠ্যাং তুলে দাঁড়িয়ে গেছে সার সার ট্রাম। মানব আর এষা একটা দোকানে মুখোমুখি বসে, দু কাপ কফি খেয়ে নিল। পরিচয়টা হঠাৎ খুব ঘন হয়ে উঠল। সেই রাতটা মানবের কেটে গেল এষাদের বাড়িতে। এষার বাবা ছিলেন আর্মি অফিসার। যুদ্ধে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। এষার মা মারা গেছেন, এষা যখন খুব ছোট।

গভীর রাতে সেই ছাদের ঘরে বসে লিখতে লিখতে মনে হল, এষা তো সত্যিই আছে; কিন্তু কবে আসবে সেই ঝড় জলের রাত। সত্যদা বলেছেন, জীবনের সব ঘটনা ঘটে আছে, আমরা সেইসব ঘটনার ভেতর দিয়ে চলতে থাকি। মহাপুরুষরা দেখতে পান, আমরা সাধারণ মানুষরা এক সময়ে বসে আগামী সময়ের কিছুই দেখতে পাই না। খালি চোখ আর দূরবীণে যা তফাৎ।

মানব এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে। মানব ডক্টরেট করবে। মানব অধ্যাপনার চাকরি পাবে। আর তৃষার সঙ্গে বিয়ে হবে ইঞ্জিনিয়ার বিশুর। এই জায়গায় এসে থমকে গেলুম। বিশুর সঙ্গে বিয়ে হবে কেন? কেন মনে হচ্ছে! বিশুকে আমি দেখেছি, এই বাড়িতে যখন আসত, তৃষার দিকে যেন তার নজর ছিল। বিশু ইঞ্জিনিয়ার হবে। অনেক বড় চাকরি করবে। গাড়ি হবে, বাড়ি হবে। বিশাল প্রতিপত্তি হবে তার। মধ্যবিত্ত জীবনের যত প্রচলিত বিশ্বাস ও আদর্শ সব তার কাছে হয়ে যাবে মৃত। বিশু বদলে যাবে। বিশু তৃষাকে চাইবে তার রূপের জন্যে। আর বিশুকে চাইবেন আমার মা।

একটা দৃশ্য ভেসে উঠল—কোথাও কোনও এক পাহাড়ী জায়গা। সাদা দুধের মতো একটা বাড়ি। সবুজ একটা লন। ঝকঝকে এক হুইল-চেয়ার, সাদা এক মাথা চুল, এক বৃদ্ধা। চোখে সোনালী চশমা। চেয়ার ঠেলে নিয়ে আসছে, দীর্ঘ, ধারালো চেহারার এক তরুণী। নীল শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ছে, খাটো চুল দুলছে কাঁধের কাছে। কে? আমার মা, আর এষা। তার মানে—

মানব এষাকে বিয়ে করেছে। বেড়াতে গেছে পাহাড়ে। সংসারে সুখ ফিরে এসেছে। প্রাচীনকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যবিত্ত সুখ।

সত্যদা বললেন, শেষটা বদলাও। ওটা তোমার জীবনের ঘটনা নয়। তোমার জীবন চলে যাবে পাশ ঘেঁষে। তোমার আর আমার জীবন এক সুরে বাঁধা। আমাদের সব থেকেও কিছু থাকবে না। আমার এই নোনা ধরা মশনদের তুমিই উত্তরাধিকারী। সংসার আমাদের দয়া করে ক্ষমা করেছে। তাই অসুখী হয়েও আমরা সুখী। আমরা জ্ঞান-ভিখারী, ফেরিঅলা। আমরা শেষ মাইল পোস্টে যাবো অন্য পথে। অন্য ভাবে।

আমার উপন্যাস ছাপা হল পূজা সংখ্যায়। সুদর্শনবাবু বললেন— পেরেছো জ্ঞানদাস। তুমি পেরেছো। সত্যদা বললেন, দায়িত্ব বাড়ল। যতটা এসেছ, এসেছ, বাকিটার সঙ্গে জীবন মেলাও। কাঁটায় কাঁটায়।

—o—